মেয়েলি আড্ডার হালচাল

বাণী বসু

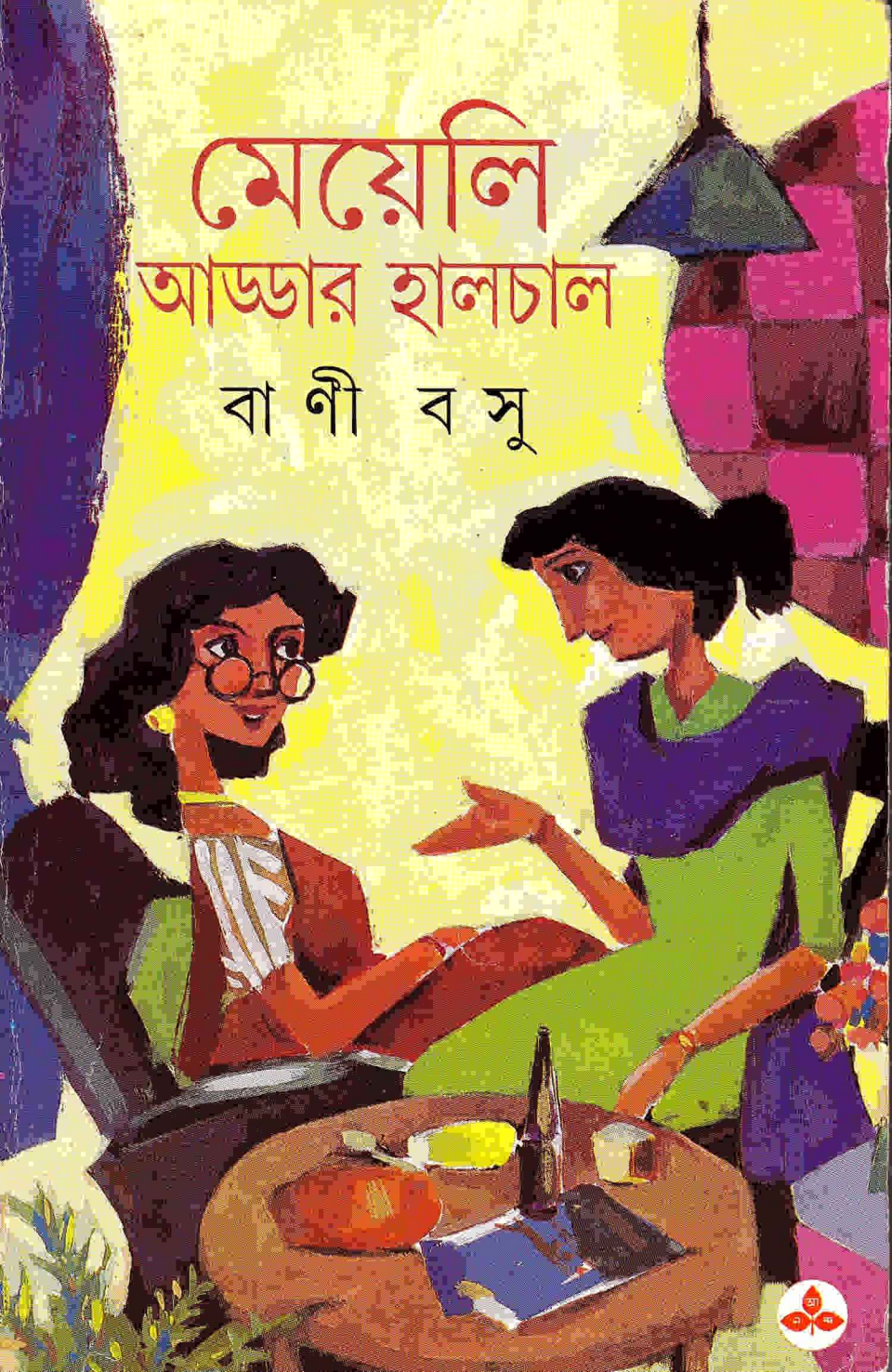

শুভারম্ভ

উপন্যাস কী এই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। এমন নয় যে আমরা সব লেখক বা অধ্যাপক বা সমালোচক, বা সাহিত্যের হালচাল এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্বিগ্ন সৎ-পাঠক। আসলে আমরা কয়েকজন বিভিন্ন বয়সের বন্ধু যারা মহা আড্ডাবাজ। এখন আড্ডার অধিকার সাধারণত পুরুষদেরই একচেটিয়া বলে মনে করা হয়। শুধু একচেটিয়া নয়, শুধু অধিকার নয় মনে করা হয় এবং ঠিকই মনে করা হয় এই আড্ডার একটা আলাদা তাৎপর্য একটা আলাদা স্বাদ আছে। ডমরুধর মহাশয়ের সেই সব আড্ডার কথা মনে করুন যাতে গুল, ধাপ্পা, কেচ্ছা, ভূত-প্রেত, গোলেবকাওলি, রূপকথা সবই চলত, অথবা পরশুরামের সেই আড্ডা যেখানে চাটুজ্জেমশাই জাঁকিয়ে বসতেন আর রায়বাহাদুর বংশলোচনের তামাক ধ্বংস করতেন, এঁদেরও লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সুরসাল বিনিময়, সঙ্গে সঙ্গে 'ভুটে' নামে পাঁঠা ক'সের মাংসের জোগানদার হয়ে উঠছে, সুযোগ পেলে ভুটেকে টিপে-টুপে নইলে স্রেফ শ্যেন দৃষ্টি ফেলে জরিপ করে নেওয়া। এ ছাড়াও ক্রিয়েটিভ আড্ডা আছে, লেখক সাহিত্যিকদের আড্ডা, বড় বড় ইনটেলেকচুয়ালদের আড্ডা, তাদের জাতই আলাদা। এই সব আড্ডা বলাবাহুল্য নারীবিবর্জিত , 'পথে নারী বিবর্জিতা' না বলে 'আড্ডায় নারী বিবর্জিতা' বলে কোনও মহাজনবাক্য থাকলে তার উদাহরণ হয়ে থাকত আড্ডার এই নারীহীনতা। মেয়েরা থাকলে আড্ডার প্রধান যে মজা— কাঁচা রগরগে ভাষা, তার চেয়েও রগরগে তামাশা এ-সব সেঁতিয়ে যায়, মেয়েরা জোরজার করে উপস্থিত থাকলেও গোলমালে পড়ে যাবেন, না পারবেন হাসতে, না পারবেন কাশতে। এ ছাড়াও অবশ্য এক ধরনের আড্ডা আছে মিক্সড্ ডাব্‌ল্‌স্-এর মতো। জোড়ায় জোড়ায় দম্পতি একটি দুটি ব্যাচেলরও থাকতে পারেন— এঁরা দিন ঠিক করে গল্প-সল্প করেন। এর মধ্যে একটা অন্তঃস্রোতা আদিরস থাকে, কথাবার্তাও একটু ফষ্টিনষ্টির ধার ঘেঁষে যায়। এই মিক্সড্ ডাব্‌ল্‌স্ আড্ডা এখনও সাবালকতা অর্জন করেনি। যাই বলুন আর তাই বলুন। অল্পবয়সী ছাত্র-ছাত্রী ক্যাডারদের যারা কফি হাউজে জাঁকিয়ে বসে এবং যাদের রেঞ্জ অলোকরঞ্জনের গদ্য থেকে ইয়ানি ইন তাজমহল, জাক দেরিদা থেকে চার্লস শোভরাজ, ফুলন দেবী থেকে জ্যাকলিন কেনেডি ওনাসিস পর্যন্ত, তাদের মধ্যেও কিন্তু একটা এগজিবিশনিজ্‌ম্-এর প্রেতচ্ছায়া থাকে, যত প্রাণ থাকে তত রস থাকে না। যত উচ্ছ্বাস তত শাঁস

থাকে না। জেনুইন আড্ডা জীবনের পরিপূরক। জেনুইন আড্ডা থেকে বেশ ঋদ্ধ হয়ে বাড়ি ফেরা যায়। কাথারসিসের মতো একটা বর্জন-প্রক্রিয়া থাকে এতে। আত্মমোচন বা আত্মমোক্ষণ। অসমোসিসের মতো একটা গ্রহণ প্রক্রিয়াও থাকে যাতে করে শেষ পর্যন্ত প্রাতিস্বিকতা বজায় রেখেও বেশ যূথবদ্ধ হওয়া যায়।

আমার বলার কথা, মেয়েদের মধ্যেও ঠিক এই জাতের আড্ডা আছে। চিরকালই ছিল। গাব্বু বা বিন্তি খেলা উপলক্ষ্য করে, বাড়ির ছেলে বা মেয়ের বিয়ে, শাদি উপলক্ষ করে এই ধরনের পুংবর্জিত মেয়েলি আড্ডা জমে উঠত, যেগুলোকে মেয়েদের ব্যাপার বা বড়জোর মহিলামহল— কুরুশ-কাঠি-গয়না-বড়ি-রান্নাবান্না-সাজগোজ আর গা-টেপাটেপি কেচ্ছার আসর বলে উন্নাসিক আড্ডাবাজরা (পুং) জাতে ঠেলে রেখেছেন। এর কিছু আসলের-চেয়েও-আসল-শুনতে উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ' ও 'ইন্দিরায়' বিশেষ করে দিয়েছেন। তার থেকেই আপনারা জানেন মেয়েদের আড্ডাও কী পরিমাণে 'কাঁচা' অর্থাৎ হাস্য-উদ্ভট-আদি (অশ্লীল) রসের আধার হতে পারে। তবু, এই মেয়েলি আড্ডার কথা আপনারা মোটেই জানেন না। অবহেলার আড়ালে আবডালে' এ আড্ডার বিবর্তনের এবং বর্তমান চেহারার কথাও আপনাদের জানা নয়। এ আড্ডা পুরুষবর্জিত এবং কোনও কারণে কোনও পুরুষের প্রবেশ ঘটলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আড্ডাংশীদের কথাবার্তা দেহভঙ্গি ইত্যাদির একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়, ফলে আপনারা সেই তিমিরেই থেকে যান যে তিমিরে অদ্যাবধি ছিলেন।

আমাদের আড্ডা ডমরুধর বা পরশুরাম বা লেখক-সাহিত্যিক-সম্পাদক বা কমলকুমার-সত্যজিৎ-বংশী চন্দ্রগুপ্ত আড্ডার প্রতিস্পর্ধী এমন দাবি আমরা কেউই করি না। আমাদের আড্ডা ঠিক আমাদের আড্ডারই মতো। নিজেদের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। আমরা রসে বশে আছি। উপরন্তু আমাদের আড্ডা ফোনেও চলে।

মালবিকাদি আমাদের, কখনও রসা কখনও খাজা কাঁঠাল, চিবিয়ে চিবিয়ে রস বার করতে হয় কখনও, আবার কখনও সুড়ুৎ করে এমন গলা গলে যায় যে কখন টের পর্যন্ত পাওয়া যায় না। সুমিতা আছে ধানি লংকা। কাজলরেখা মিত্তিরকে বলা হয় সাড়ে বত্রিশ ভাজা। আমাকে ওরা ওদের মুড অনুযায়ী কখনও বলে ঝুনো নারকেল কখনও বলে 'চাই কচি ডাব'। মোট কথাটা একই বাইরে ঢাকাঢুকি, ফাটালেই টইটম্বুর। আর শিল্পী যে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়সে ছোট এবং চেহারায় লম্বা তাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি 'যার-পর-নাই'— কেন সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। আরও একজন আজকাল থাকছে তার নাম শেফালি। সে আমার কম্বাইন্ড হ্যান্ড।

উপন্যাস কী এই নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। একমাত্র আমিই এখানে একটু-আধটু লিখি এবং সেই সুবাদে কিছু প্রতিষ্ঠিত লেখিকা যেমন কণা

বসুমিশ্র, কৃষ্ণা বসু (কবি), মল্লিকা সেনগুপ্ত, অনীতা অগ্নিহোত্রী— এঁদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ আছে। সুমিতা একটি কলেজের সাইকলজির অধ্যাপিকা। তার অবশ্য প্রচুর চেনাশোনা— গীতা ঘটক, সুমন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গায়ক, মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার, মমতাশংকর প্রমুখ নৃত্যশিল্পী, পার্থ-গৌরী ঘোষ, জগন্নাথ-উর্মিমালা বসু প্রমুখ শ্রুতিশিল্পী, শানু লাহিড়ি, দীপালি ভট্টাচার্য প্রমুখ চিত্রশিল্পী— এঁদের সঙ্গে নাকি ওর ওঠা বসা। এঁদের ও দিদি দাদা বলে। মালবিকার একটি নারীসমিতি আছে, সেই সুবাদে যখন তখন সে প্রদর্শনী করে, উচ্চমূল্যে মেয়েদের নানা রকম হাতের কাজ বিক্রি করে সে নিজের এবং তার সমিতির নারীদের জন্য প্রচুর পয়সা কামায়। বৃহত্তর কলকাতার কোনও কোণে এমন কোনও পয়সা-অলা নারী নেই যে মালবিকাদির ফাঁদে না পড়েছে। আড্ডার বাইরে মালবিকাদি একরকমের পৌরাণিক সাপ, তার শর্মিলি হাসি, প্রচুর বয়-ছাঁট নুন-মরিচ চুল, চোখা নাক এবং চোখাতর কলাকৌশল ঠিক মন্ত্রমুগ্ধ হরিণের মতোই তার খরিদ্দারদের কাছে টেনে আনে, তারপর মালবিকাদি তাকে টপ করে গিলে ফেলে। যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো তারা। অর্থাৎ যে কাস্টমার গ্রীষ্মে মলমলের ছাপা নিয়ে গেছে সে শীতে আবার সিল্কের ছাপের জন্য ফিরে আসবে। বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে পরবার জন্যে মধ্যবয়স্কার দুধ গরদের ওপর সোনালি খাড়ি ও বাদলার কাজ, গরমের দিনে অন্নপ্রাশনে পরবার জন্য সাউথ কটনের ওপর তাঁত প্রিন্ট, জন্মদিনের পার্টিতে যাবার জন্যে গর্জাস কালো শিফনের সালোয়ার-কুর্তা-এ সবের জন্যে এঁরা মালবিকা সান্যাল ছাড়া কোথাও যাবেন না। বাকি দুজন অর্থাৎ কাজলরেখা মিত্তির এবং শিল্পী বরাট বিশুদ্ধ গৃহবধূ। তবে অদূর ভবিষ্যতে গৃহবধূদের অ্যালাউয়েন্স পাশ হবার অনেক আগেই এদের স্বামীরা এদের নানা রকম অ্যালাউয়েন্স দিয়ে রেখেছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে যদিও বাধ্য হওয়ার ব্যাপারটা তারা আদৌ বুঝতে পেরেছে কি না সন্দেহ।

অর্থাৎ উপন্যাস, শিল্পের সঙ্গে আমরা কেউই প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নই। তবু যেহেতু উপন্যাস পড়ে থাকি, সেহেতু অধিকারের তোয়াক্কা না করেই এ বিষয়ে মতামত আদান-প্রদান করতে আমরা ছাড়ি না।

দিনটা ছিল শুককুরবার। বেস্পতিবার রাত্তিরে সুমিতা আমায় ফোন করে, ফোন ধরে হ্যালো বলতেই খরখর করে উঠল— 'কী রে ? বাটা মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খাচ্ছিলি ?'

'খাচ্ছিলুম ঠিকই। কিন্তু বাটা মাছের ঝাল এবং ভাত এই কংক্লুশনে কী করে এলি ?'

'ভাত খাওয়ার সময়ে একটা ভ্যাদভেদে গলা বেরোয়, তোর সেটা বেরোচ্ছে। দাঁতের ফাঁকে একটা কুচো কাঁটা আটকেছে, যা একমাত্র বাটাতেই সম্ভব, তাতে তুই ফোকলার মতো ফকফক করছিস। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট মাই ডিয়ার ওয়াটসন।'

আমি বলি— 'কংগ্র্যাটস হোম্‌স্‌ ফর রং ইনফারেন্স। আজকে আমার উপোস।'

'এই যে বললি খাচ্ছিলি ? ধাপায় শীগগিরই পা রাখবি মনে হচ্ছে!'

'আজ বেরস্পতিবার সে খেয়াল আছে ? চৈতলক্ষ্মীর পুজো সেরে এই মিনিট দশ উঠছি। পেসাদ খাচ্ছি।'

'তুই আজকাল লক্ষ্মীপুজা করবার ধইচ্ছিস ? মুই ভাবিছু মোর রঞ্জু দিদির সরস্বতীক পুজা করা নাগে।'

'আরে বাবা, লক্ষ্মী সরস্বতীর পুরনো ঝগড়াটা অনেকটা মিটে এসেছে।'

'তা সত্ত্বেও উপোসটা বিশ্বাস করলুম না। পেসাদ না আরও কিছু। লক্ষ্মীপুজোয় বেশ ভালই সাঁটানোর ব্যবস্থা আছে। লুচি-ফুচি।'

আমি বলি— 'ফুচি একদম বলবি না। আমার শাশুড়ির নাম। তিনি স্বর্গে গিয়ে থাকতে পারেন কিন্তু তাঁর নামের কোনও অপমান আমি হতে দেব না। তবে তুই ধইচ্ছিস ঠিকই। নুচির ব্যবস্থা আছে। সাঁটানোও হয়ে গেছে। ওটাই তো পেসাদ। তবে দ্যাখ এই চোত মাসের জ্বলি-জ্বলি গরমে ভাত বন্ধ মানেই উপবাস। জানিস তো উপবাস-এর আসল মানে সংযম। ভেতোর কাছে ভাত না খাওয়াটাই একটা মস্ত সংযম।'

'এটাও বাজে কথা বল্লি, মানে ধাপে পা। লক্ষ্মী পুজো নিজে করতে না পারি কিন্তু পুজোর সকালে যে নৈবিদ্যির চাল ভাতে-ভাত করে গাওয়া ঘি দিয়ে খাওয়া হয় এ কথা আমার জানা আছে।'

'সে তো সকালে। রাত্তিরে দ্যাখ নুচি। নুচি হল গিয়ে জলখাবার।'

'শোন ভাতাহারী, বাজে কথা রাখ, কাল আমার নতুন অফ ডে, তোর বাড়িতে মেলাদ হবে, নামাজ করতে যাব।'

'খুব বাংলাদেশি উপন্যাস পড়ছিস মনে হচ্ছে ?'

'পড়ছি-ই তো। ওদের সব হাতে-গরম পাতে-গরম। এক বার ব্যানটা উঠে গেলেই আর তরা হালে পানি পাইচ্ছিস না। ঢাকাই-চাটগাঁই-সিলেটি-আরবি-ফারসি মিলিয়ে ভাষাডা এক্কেরে ভোল পাল্টাইয়া ফ্যালাইসে।'

আমার প্রান্তে অতঃপর নীরবতা। ওদিক থেকে আবার প্রশ্ন এল— 'কী রে ? কিছু-কিঞ্চিৎ বুঝলা ? লিটর‍্যালি হতবাক কইর‍্যা থুইসি তয়!'

এতক্ষণে ক্ষীণ কণ্ঠে বলি— 'ব্যাবাক।'

'গুড, চটপট লেসন নিয়ে নিতে পারিস। এই গুণেই ভবসাগর তরে যাবি।'

'খাস বাত কুছ হ্যায় ?' —আমি জিজ্ঞাসা করি।

'শিল্পী ফিরেছে ব্যাংকো থেকে। ওকে নিয়েই যাচ্ছি। তোর জন্য পেপার ওয়েট এনেছে। ট্রান্সপেরেন্ট। ভেতরে চাকা চাকা হাসি-হাসি খোকা খুকু মুখ ভেসে বেড়াচ্ছে। যেই লিখতে না পেরে মন-খারাপ হবে অমনি পেপার

ওয়েটটা দেখবি আর মন ভাল হয়ে যাবে।'

'আর তোর জন্যে ?'

'বলব কেন ?'

'নিশ্চয়ই আরও ভালও। আরও দামি কিছু'...

'হিসকুটেপনা করিস না।' —বলে সুমিতা ওর জন্যে শিল্পী কী এনেছে না বলেই কটাং করে ফোন রেখে দিল।

আমিও কাজলকে ফোন করে দিই। সুমিতাকে সামলানো আমার একার কম্মো নয়। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আবার আছে ব্যাংকক-ফেরত শিল্পী।

শিল্পী আমি কাজল সুমিতা। এ কী ? চারজন হয়ে গেল যে ? এ তো দেখছি শিল্পীতে-আমাতে কাজল-সুমিতাতে লেডিজ ডাবলস হয়ে যাবে! সার্ভিসের সময়ে কর্নার টু কর্নার হবে ঠিকই। কিন্তু পরবর্তী খেলাটাতে শিল্পী-আমি কাজল-সুমিতা এমন আলাদা হয়ে যাব যেন দুটো সিংগলস হচ্ছে। এক দিকে মেরি পেয়ার্স-এর সঙ্গে ইয়ানা নোভোৎনা, আর এক দিকে সাবাতিনির সঙ্গে সানচেজ ভিকারিও। নাকটা ঠিকঠাক গলাবার জন্যে একজন পঞ্চমী চাই। মালবিকাদিকে ফোন করলুম— নামটা করবার একটু পরেই টেলিফোনটা কোঁ কোঁ করতে লাগল। এ আবার কী ঢং ? সম্প্রতি মালবিকা সান্যালের ফোনে মুরগি ছানা ঢুকেছে। এই মুরগিকে পবিত্র কুরবানি করবার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল। কিন্তু সাড়ে ন'টা বাজে, এখন তো আর কমপ্লেন সেল চালু নেই!

কাজলকেই আবার ফোন করলুম, মালবিকাদির মহিলা-সমিতি কাজলদের বাড়ির খুব কাছে, ওখান থেকেই ধরে আনবে এখন। মহিলা-সমিতিতে সারা বছর মহিলা কুটোটি নাড়ে না। খালি অর্ডার ধরাবার সময়ে আর বিক্রির সময়ে দেখা যায় ওর খেল। আড্ডার গন্ধ পেলেই ঠিক চলে আসবে। 'আবার কী ?' কাজল খেঁকিয়ে উঠল, 'এই তো এক ঘণ্টা ধরে ফোন করলি শিল্পী তোর জন্যে কম দামের, সুমিতার জন্যে বেশি দামের গিফ্‌ট্‌ এনেছে বলে নাকি কান্না কাঁদলি—।' এ সব একদম ঝুট। এক ঘণ্টা কেন আমি দশ মিনিট ধরেও ফোন করিনি। করব কেন ? বিল তো আমারই উঠবে ? আর শিল্পীর গিফ্‌ট্‌ আসছে বলে আনন্দ করেছি, নাকি-কান্না মোটেই কাঁদিনি। আমি যা করেছি তাকে বলে স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্ট। বলেছি 'শিল্পী আমার জন্যে পেপার-ওয়েট এনেছে। সুমিতার জন্যে কী এনেছে কিছুতেই বলল না।'

সুতরাং ফোনযন্ত্রের মধ্যে আমিও ডবল খেঁকিয়ে উঠি— 'কেন তোর অসুবিধে কী ? ছেলে-মেয়ের পড়া অনেক দিন ধরেই ধরতে পারিস না। অধ্যাপক মশাই আপনভোলা মানুষ— সাপ খেতে দিলি কি ব্যাঙ খেতে দিলি বুঝতেও পারবেন না। তা ছাড়া ফোনটা করেছি আমি ; তোর তো আর...'

'হ্যাঁ, আপনভোলা মানুষ! ঘর করতে হলে বুঝতে পারতে তার হ্যাঁপা কত!

স্থাপিত-১৮৯৭ খুলনা

রাত্তিরেই জুতোর জোড়া মিলিয়ে রাখতে হয় তা জানো ? নইলে এক পায়ে মোকাসিন এক পায়ে পাম্প পরে হাঁটা দেবে। পাঞ্জাবি-ধুতির সঙ্গে গেঞ্জি সাঁটিয়ে রাখতে হয়, নইলে গেঞ্জি ছাড়াই চলে যাবে আর পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবির মধ্যে দিয়ে— ম্যাগো। ছি ছি !'

কাজল এমন করে উঠল যেন ওর বর বর নয়। বরনারী।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেক কাজ তোর, জানি। গেঞ্জি রাখবি, পাঞ্জাবি রাখবি, ধুতি রাখবি না হলে তোর আপনভোলা হয়তো ধুতি পরতেও...'

'ঠিকাছে, ঠিকাছে আমার বর ভুলো, বোম্‌ভোলা, পাগল, তার পেছনে কুকুর চেঁচালে তোরা খুশি হোস, আমি...'

'আমি তোমার সঙ্গে গপ্পো ফাঁদতে বসিনি বাবা। আমার অনেক কাজ। মালবিকাদিকে কাল মহিলাসমিতি থেকে তুলে নিয়ে এসো। ফোনে পাচ্ছি না। এটাই বলার ছিল।' 'কেন ? আবার মালবিকা সান্যাল কেন ? শুধু কাজলিকাতে হবে না ? মালবিকাদি শেষে আবার ওর সমিতির জন্যে চাঁদা তুলবে। আমার ভাই টিনের বাক্সে রেস্ত কম। সব লক্ষ্মীর হাঁড়িতে ফেলে দিয়েছি।'

'সেই জন্যেই চারদিকে এত রেজগির হাহাকার, বুঝেছি। তবে মালবিকাদির চাঁদা তোলা ছাড়াও আরও গুণ আছে।'

'কী গুণ ? বেগুন ? না গুনিনের তুকতাক।'

'ওই হল, স্টকে প্রচুর গপ্পো।'

'তোর কি রাজকন্যা কম পড়িয়াছে ?'

'আমার তো সব সময়েই কম পড়ে যাচ্ছে। যত ডিমান্ড তত সাপ্লাই নেই।'

'তো দেখি।'

কাজলা আমাকে আশ্বস্ত করে বোধ হয় বরের তত্ত্ব গোছাতে গেল।

ফোন থেকে মুখ তুলে দেখি জানলার ফ্রেমে লাল আকাশ। রাতের রং আর ঝড়ের রং মিলে টকটকে লাল। রাগী বাইসনের কুচি চোখের মতো। এই রে, কোথাও থেকে এটা টুকলুম নাকি ? বাইসন তো কখনও জ্যান্ত দেখিনি। রাগী তো দূরের কথা ! রাগী বাইসন স্বচক্ষে দেখলে বোধ হয় সে-কথা কাউকে জানাবার আর উপায়ও থাকে না। এক যদি কেউ দয়া করে প্লানচেটে ডাকে। তারপরে মনে পড়ল—না, টুকিনি, আমি আসলে বুল ফাইটের বুলদের কথা ভাবছি। বুল ফাইট টি.ভি স্ক্রিনে দেখেছি। বুল এবং তার মাটাডর।

সারা কলকাতা এখন সওনা বাথ নিচ্ছে। কী শুকনো গরম ! মনে হচ্ছে একটা দেশলাই কাঠির ওয়স্তা। কেউ বিড়ি ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা ছুড়ে ফেলবে আর আমরা সব বাড়ি-ঘর মাঠ-ময়দান রাস্তা-ঘাট সব সুদ্ধ নিয়ে দপ করে জ্বলে উঠব। দা গ্রেট ক্যালকাটা ফায়ার।

অদূরে একটা ধুলোর ঘূর্ণি উঠল, কলেজ স্ট্রিটের ট্রামের তারগুলো ঝাপসা লাগছে। মরুঝড় ! মরুঝড় ! মুখ গোঁজা উচিত। কিন্তু তা হলে দেখব কী করে ? হু হু করে কনকনে ঠাণ্ডার একটা পুঁটলি মরুঝড়ের বৃহত্তর ঘুরনচাকির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। আ-হ। তারপরেই গোঁ-ও-ও, হুটপাট দুমদাম ঝড়ের শব্দকল্পদ্রুম শুরু হয়ে গেল।

আমি জানলা বন্ধ করি না। প্রচুর ধুলো ঢুকতে দিই কার্বন, লেড মেশানো ধুলো। তা হোক। ঝড়কে না হলে বুকে নেব কেমন করে ? এই ভাবেই তো ঝড়কে আলিঙ্গন করতে হয়। ঝড়ের কড়া দাড়িয়াল মুখের চুমু খাই গালে, কপালে, চামড়া-ছেঁড়া দুঃসহ আদর। তারপরই বুনোদের বিষাক্ত তীরের ফলার মতো ফটাফট বৃষ্টি। পূব-দক্ষিণের জানলার মধ্যে দিয়ে ইঁট-কাঠ-লোহার বাধা হাজার হাতে সরিয়ে ঝড় আমাকে নেয়। আমি ঝড়কে নিই।

প্রথম অধিবেশন

যাক, এত ঝড়, এত বৃষ্টি ! কালকের দিনটা ঠাণ্ডা হবে। কালকের দিনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আড্ডার সুযোগ তো চট করে আসে না আজকাল !

তা সেই আড্ডাতেই আমাদের উপন্যাসের কথা উঠেছিল। অপরাধের মধ্যে বলেছিলুম—'তোরা কেউ একটা ভাল প্লট দে না রে, একটা উপন্যাসের চেষ্টা দেখি।'

'তুই লিখবি উপন্যাস ?' সুমিতা হেসে উঠল। 'তুই তো অস্থির, চঞ্চল, খ্যাপা।'

'কেন ? ছোটগল্প লিখতে পারছি, রম্যরচনা লিখতে পারছি, উপন্যাস পারব না কেন ?'

মালবিকাদি বলল, 'দ্যাখ, রম্যরচনা তাকেই বলে যার কোনও গম্য নেই। সেটা তোকে সুট করে। আর ছোটগল্প ? বাগদা চিংড়িও চিংড়ি, গলদা চিংড়িও চিংড়ি আবার ঘেসো ধেনো চিংড়িও চিংড়ি। সমুদ্রে যে তিমি-খাদ্য ক্রিল ভাসে তাকেও চিংড়িই বলছে।

'মানে ?'

'বিমল করের বিশ পাতার ত্রিশ পাতার গল্পও ছোটগল্প আবার বনফুলের দেড় পাতার গল্পও ছোটগল্প। তুই এর মধ্যে যেখানে ইচ্ছে নিজেকে ফিট করে নিতে পারিস। ধর ভাত বসিয়েছিস। ওথলাল, উঠে ঢাকাটা নামিয়ে দিলি। এ বার ঝট করে তোর গপ্পো শেষ করতে হবে বুঝে গেলি। ফ্যান গালবার সময়ে তোর গপ্পো শেষ। সেনটেন্স শেষ না হলেও কিচ্ছু এসে যাবে না।

এই সব অবোধ যাকে বলে নাদান বালিকাদের আর ছোটগল্পের আর্ট কী বোঝাব !

শিল্পী আমাদের কোমরের বয়সী পাকা মেয়েটা কটকট করে

বলল—'এক্সপিরিয়েন্স চাই রঞ্জনাদি, এক্সপেরিয়েন্স। পৃথিবীটা দেখতে হবে, পাঁচটা দেশের মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, সবটাই আবার সোজাসুজি। ভায়া মিডিয়া নয়। ছোটগল্প তুমি আশপাশ থেকে পিক আপ করতে পারো, আর রম্যরচনা তো খানিকটা এলোমেলো এলেবেলে লিখে গেলেই হল। যেমন আমরা পরীক্ষার সময়ে 'এসে' লিখতাম। কিন্তু উপন্যাসে ফাঁকি চলে না—একখানা 'ডেভিড কপারফিল্ড'ই বলো, কি একখানা 'ওয়র অ্যান্ড পীস'ই বলো, কি একখানা 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'ই বলো।

গম্ভীর মুখে কাজলের দিকে চেয়ে বললুম—'কী রে, কাজল ? তুই কিছু জ্ঞান দিবি না ? বাদ যাচ্ছিস কেন ?'

'থাকলে তো দেব ?' —ভ্রূভঙ্গি করে কাজল বলল— 'আমার বর যদি সব জ্ঞানের গোঁসাই হয়ে বসে থাকে তা হলে আমার ভাঁড়ে মা ভবানী ছাড়া আর কী থাকবে বল ?'

এই সময়ে শেফালি লম্বা ডাঁটির গেলাসে বরফ দেওয়া জিরাপানি নিয়ে ঢুকছিল।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। ছেলেদের আড্ডায় শুনি খবরের কাগজে মুড়ি-পেঁয়াজ মাখা ঢালা থাকে, কাঁচালংকা, বেগুনি এ সবও। আর গোদা গোদা কাপে রাম-কড়া ঘন দুধ দেওয়া চা, কিংবা হাতে হাতে মুঠো মুঠো ছোলাসেদ্ধ উঠে যায়, বোতল বোতল দেশি বিদেশি থাকে। টং হয়ে সব আড্ডা দ্যান। এগুলো মেয়েদের সাহায্য না থাকলে। কারও বাড়ির বৈঠকখানায় বা লিভিংরুমে আড্ডা হলে অবশ্য আলাদা কথা, সেখানে গৃহিণীরা ককটেল থেকে কাঁকরোল ভাজা পর্যন্ত সবই দরকার মতো জোগান। তাকে স্ব-নির্ভর আড্ডা বলা যায় না। আমাদের আড্ডা কিন্তু স্ব-নির্ভর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। খাবারদাবার বা পানীয়র কোয়ালিটি খুব ভাল থাকে। যে কোনও সময়ে আমরা চা-বেগুনি খাই না। শরবতের সময়ে শরবত, চায়ের সময়ে চা। বেগুনির সময়ে বেগুনি, বিরিয়ানির সময়ে বিরিয়ানি।

আপনারা বলবেন আমরাও তো স্ব-নির্ভর নই, শেফালি-নির্ভর। স্বয়ংসম্পূর্ণ নই শেফালি দ্বারা পূর্ণ। কিন্তু আপনাদের জানা দরকার ওই জিরাপানির জিরা মাপ মতো আমিই গ্লাসে গ্লাসে ঢেলে এসেছি, শেফালিকে বহু চেষ্টায় শিখিয়েছি—মিষ্টি না দিয়েও শরবত হয়। তা ছাড়া শেফালিও আমাদের আড্ডার মেম্বার। এক জন রবাহুত মেম্বার অবশ্য। কিন্তু মেম্বার ঠিকই। তার কথাতেই এ ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

গ্লাসসুদ্ধ ট্রেটা আমাদের মাঝখানে নামিয়ে রেখে কোমরে হাত দিয়ে, নাকছাবি ঝিকিয়ে সে বলল—'জ্ঞান গোঁসাইয়ের গান তো গত পরশুই টি.ভিতে হচ্ছিল। "দীনতারিণী দুখহারিণী ভবানী মা," বাপ নাকি সুরে সে কী চিৎকার ! ভবানী মা পেইলে যাবে।'

মালবিকাদির সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার-কাম-সাক্ষরতা-

অভিযান-কাম-অপসংস্কৃতি-নিপাত যাক—সত্তা জেগে উঠল। সে বলল—'তুই জানিস জ্ঞান গোঁসাই কে ? কী ? স্বয়ং রাধিকা গোস্বামীর ভাইপো আবার শিষ্য। তাঁর সম্পর্কে তুই...।'

'মেয়েছেলের শিষ্য হলেই তাকে মাথায় তুলে নাচতে হবে ?'—শেফালি উবাচ—'গোঁসাইয়ের ব্যাটা গোঁসাই কিষ্ণর ব্রজলীলের গান গাইতে পারত। কালী মা কাঁচা খেকো মেয়েমানুষ বাবা...তা ছাড়া যাই বলো আর তাই বলো ঠাকুরদেব্‌তার গান আমার ভাল লাগেনাক'। বুড়ো হলে শুনব অখন। বয়সকালে কি আর ও সব প্যানপ্যানানি মনে ধরে ? আমার বাবা সাফ কথা।'

'যা এখান থেকে পালা,' আমি বিরক্ত হয়ে বলি। মালবিকাদিকে বলি—'প্লীজ, ওকে রিফর্ম করবার চেষ্টা কোরো না।' মালবিকাদি তবু ছাড়ে না—'কী তা হলে তোর বয়সকালের গান ? কী ভাল লাগে ? তুমি আমার আর আমি তোমার ?'

'ধক ধক ধক ধক'—শেফালি চোখ বড় বড় করে বলে, তারপর পালিয়ে যায়।

কেন না আমি চাঁটা তুলেছি।

'নিজের স্বার্থে একটা গরিবের মেয়ের পরকাল ঝরঝরে করে দিচ্ছিস রঞ্জু !' মালবিকাদি আমায় ধিক্কার দেয়।

কিন্তু শেফালি কপাটের আড়ালে তার সবুজ ডুরে শাড়ি কোমরে জড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল—'বউদির কী দোষ ! সে মানুষ আমাকে খাওয়াচ্ছে, মাখাচ্ছে কত কী নতুন নতুন ঘোঁত ঘাঁত শেখাচ্ছে যাতে আমি পরে আরও বেশি মাইনেয় বড়লোকের বাড়ি কাজ পাই। আমার এহকাল পরকাল ঝরঝরে করেছে যে মিনসে সে তো এখন ভাঁটাচোখো, কুপো-গতর, মিস্তিরি মাগির সঙ্গে দিব্যি স্বগ্‌গো বাস করছে গো। মেয়েছেলেদের জন্যে এত মিটিন অ্যাতো মিটিন করছ দিদি। এই সাত চাখুনি-মিনসেগুলোর একটা হিল্লে করতে পারো না ?'

'কী রকম হিল্লে তুই চাস ?'

'কী রকম আবার ? শূলে দেবে। জ্যান্তে শূলদণ্ড। পেছন দিয়ে ঢুকবে, মুণ্ডু ফুঁড়ে উঠবে।' বলাবাহুল শেফালি 'পেছন' শব্দটা ব্যবহার করেনি। তবে এবার সে সত্যিই পালায়।

কারণ, আমি উঠে দাঁড়িয়েছি, হাতে উদ্যত চাঁটা। সুমিতা মিটমিটে হেসে বলল—'এই আনকাট ডায়মন্ডটিকে কোথা থেকে জোগাড় করলি রে ? "ভাঁটা-চোখো" "কুপো-গতর" "সাত-চাখুনি" এ তো একেবারে গোলকোণ্ডা রে ! তোর ডায়লগ লিখতে কাজে দেবে। ভাল ভাল...এর ওপর আবার টি.ভিটাও ওর হাতে ছেড়ে দিয়েছিস ! এ রোগ তোমার হাজার অ্যান্টিবায়োটিকেও বাগ মানবে না মালবিকাদি।'

আমি কাঁচুমাচু মুখে বলি, 'কী করি বল। ও যদি খুশি হয়ে কাজগুলো না

করে আমার লেখাপড়া হয় না। ভাত বসিয়ে লিখতে শুরু করলে ভাত পুড়ে যায়, দুধ বসালে ভুলে যাই, দুধ উথলে যায়।'

কাজল কায়দা করে আজকে প্লেন করে একটা হাতিপাড় শাড়ি পরেছে। ঝনাত করে চাবির গোছা পিঠে মেলে বলল—'তুই না লিখলে বোধ হয় বঙ্গ-সাহিত্য কানা হয়ে যাবে!'

'যা বলেছিস কাজল, স্রেফ নিজের ছাই-ভস্ম স্বার্থের জন্যে তুই একটা আনপড় মেয়েকে করাপ্ট করছিস রঞ্জনা। অথচ আমরা চাইছি একেবারে গ্রাসরুট লেভেল থেকে মেয়েরা মার্জিত হোক, শিক্ষিত হোক।' মালবিকাদি উৎসাহিত হয়ে বলে, 'তার চেয়ে এক কাজ কর, লেখা ছেড়ে দে। লিখে তো তোর কাগজের দামও বোধ হয় উশুল হয় না। টু এক্সপেনসিভ এ হবি। তোর লেখা তোর বরেরও একটা এক্সট্রা লায়েবিলিটি। তুই এই শেফালিকে লেখাপড়া শেখা। আমি সমিতি থেকে তোকে বইপত্তর, গাইডলাইন সব দেব এখন। সে বাবদে তোকে খরচা করতে হবে না। তা ছাড়াও তোর এক বছরের চাঁদা মাফ। কেন না একটা কাজ ইকোয়ালস হাজার টাকা চাঁদা।'

আমি বেশ কোণঠাসা হয়ে গেছি। সবাই আমার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে। আমি এক্ষুণি চাপে পড়ে না-লেখার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলব, আর ওরা চিয়ার্স দেবে। কিন্তু বেড়ালও কোণঠাসা হয়ে গেল ফোঁস করে, তো আমি তো মানুষ! আমি বলি—'ঠিক আছে। মেনে নিচ্ছি আমি লেখা বন্ধ করে দিলে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। লিখব না। প্লটও চাইব না তোমাদের কাছ থেকে, কিন্তু আমারও কিছু দাবি-দাওয়া আছে।'

'দাবি-দাওয়া? তুই কি শিল্পীর মেয়ের সঙ্গে তোর ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করছিস?'

'বা, বা মালবিকাদি,' আমি হাততালি দিয়ে উঠি, বিদ্রূপাত্মক হাততালি। 'নারীকল্যাণের জগদ্ধাত্রী মা জননী দাবি-দাওয়া শুনেই অমনি পণের রেফারেন্স টেনে আনলে!'

মালবিকাদি একটু অপ্রস্তুত হয়েছে। বলল—'স্যরি। ও সব কী জানিস? কান আর মুখের বদভ্যাস! যাবে কোথায়! জন্মের আগে থেকে শুনছি কি না, ওই জঘন্য ফাইভ-লেটার ওয়ার্ডটা! তা বল তোর কী দাবি?'

আমি ভালমানুষের মতো মুখ করে বললুম—'পানটা তুমি ছেড়ে দাও। জর্দা-পান-পানপরাগ।'

'বলিস কী রে? কত দিনের অভ্যেস তা জানিস? তা ছাড়া মোষের মতো খাটি। বাড়িতে সাত শরিকের কারও না কারও বাড়িতে একটা বিয়ে, কি ছেরাদ্দ কি অন্নপ্রাশন লেগেই আছে—আমার ছেলেপিলে নেই, আমাকেই সবাই খাটায়। তার ওপরে আছে মহিলা সমিতি। মেয়েগুলোর ঘরে লঙ্কাকাণ্ড বেঁধেই আছে। তখন সে সব শায়েস্তা করতে সমাধান করতে অসুরের মতো শক্তি লাগে, জানিস?'

'পান, পানপরাগ কিন্তু খুব খারাপ! জর্দা তো আরও। তামাক থাকে।'

'ক্যান্সারের জমি তৈরি করছ।'

'সে দ্যাখ তোদের বিকাশদা চেন-স্মোক করে, ঘরের মধ্যে সব সময়ে আমার প্যাসিভ স্মোকিং হয়ে যাচ্ছে। আজকাল তো ডাক্তারেরা বলছে প্যাসিভ স্মোকিংয়ে ক্যান্সারের বেশি চান্স।'

আমি বলি, 'ডাক্তারের কথা ছাড়ো। ডাক্তারে কী না বলে, মোক্তারে কী না খায়! কিন্তু তুমি নিজে সামান্য নেশার জন্যে ক্যান্সার আহ্বান করবে।'

'সে দ্যাখ তোদের বিকাশদার যদি হয়, তা হলে আমি তার চিত্তবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রী আমার ক্যান্সার না হওয়াটা কি ভাল দেখায়?'

আমি হাঁ হয়ে যাই— ক্যান্সার নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করছে এই মহিলা? বলি— 'সব কিছু লাইটলি নেবার একটা সীমা আছে মালবিকাদি। ওই ভয়াবহ রোগ নিয়ে তামাশা করছো? এর পরে বোধ হয় এডস নিয়েও তামাশা করবে? কী-ই বা শিখবে তোমার সমিতির মহিলারা তোমার কাছ থেকে? চোখের সামনে দেখবে তাদের পতিতোদ্ধারিণী দিদিমণি চবৎ চবৎ করে পান চিবোচ্ছেন। তো তারাও চিবোবে। তারা নিশ্চয়ই তোমার চেয়েও বেশি খাটে। তাদের নেশার জরুরত্ নিশ্চয় তোমার চেয়েও অনেক বেশি! লাইফও তাদের অনেক দুঃসহ। তোমার ঘরে বর শুধু স্মোক করে, শরিকেরা খাটায়...'

'ঝগড়াও করে।' মালবিকাদি তাড়াতাড়ি বলে— 'কোঁদল যাকে বলে।'

'আচ্ছা ঝগড়াও করে, কিন্তু তোমার মহিলাদের তো বরেরা পেটায়, ছেলেরা পেটায়। বিড়ির গন্ধ, বাংলুর গন্ধ তার ওপর জুতো সেলাই থেকে...'

'বুঝেছি বাবা বুঝেছি। সামান্য দুটো পান খাই, তার জন্যে এত কথা শোনাচ্ছিস।'

'ছাড়বে না তা হলে?'

'না।'

কাজলকে বললুম— 'কি রে কাজলা চৈত সেলে কখানা শাড়ি কিনলি?'

কাজল সোৎসাহে এগিয়ে বসে— 'সেল ফেল নয়, প্রভাদির কাছ থেকে ইনস্টলমেন্টে পাই বলেই কেনা। বড্ড জোর করে। ধর দুখানা জে পি কোটা, তাঁত প্রিন্ট তিনটে— সব ফুলিয়ার ওপর। বেনারস নেট কিনেছি একখানা, রং একেবারে লাইট পীচ, আসল বাংলাদেশি ঢাকাই মোটে একখানা। হাঙ্কা সী-গ্রিন তার ওপরে সাদার কাজ নো জরি। শাড়িটা দেখলে তোদের মাথা ঘুরে যাবে।'

'মোট সাতখানা হল তা হলে! তা পরবি কোথায়? সিনেমা যেতে?'

'দূর, সিনেমা আবার ভদ্দরলোকে যায়? আমি যা দেখার বাড়ি বসে দেখি। 'গন উইথ দা উইন্ড', 'সাউথ প্যাসিফিক' সব পুরনো দিনের ছবি, ইদানীং-এর 'উনিশে এপ্রিল', 'জুরাসিক পার্ক' সব বাড়িতে দেখেছি।'

'তবে? পরবি কোথায়?' আমি পুনরাবৃত্তি করি।

বিমর্ষ মুখে কাজল বলল— 'সত্যি রে বোশেখ জষ্টির বিয়েতে মুখে বড্ড পাউডার ফুটে ওঠে, টিপও খসে যায়, নতুন শাড়ি পরাও এক যন্ত্রণা, আষাঢ় শ্রাবণে তো দামি শাড়ি পরা হেভি রিসকি। এ বার বছরটা ধু ধু করছে, ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক তো একেবারে মরুভূমি। একটা ভাত-বাড়ি কি একটা শ্রাদ্ধ বাড়িও যদি হয়— নেটটা কি ঢাকাইটা ট্রাই করা যেত!'

'বা বা বা!' মালবিকাদি চেঁচিয়ে ওঠে— 'রঞ্জু, তোর বন্ধুগুলো তো সব দেখছি তোরই মতো। ভরতের আত্মীয় যত সকলি ভরতের মতো। বা বা, শাড়ি ভাঙবার জন্যে ওনার শ্রাদ্ধ চাই!'

'আমার শ্রাদ্ধ নয়', কাজল শুধরে দেয়। 'অন্য লোকের শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ একটা নেসেসারি ইভল মালবিকাদি, বি প্র্যাকটিক্যাল। যতই দুঃখু করো মানুষ মরবেই। মরলে শ্রাদ্ধ হবেই। শ্রাদ্ধ হলে ব্রাহ্মণ ভোজন, নিয়মভঙ্গ হবেই, আর ব্রাহ্মণ ভোজনে তাঁত প্রিন্ট, নিয়মভঙ্গে নেট। শ্রাদ্ধ বাসরের জন্যে কালা পাড়ের লাল পাড়ের কিছু দশ হাজার বুটি আমার তোলাই থাকে।'

মালবিকাদি কী যেন বলতে যাচ্ছিল, আমি আর কথা বাড়াতে না দিয়ে বলি— 'কিনিস না।'

'কিনিস না?' কাজল ক্যাঁক ক্যাঁক করে ওঠে, 'আমার নিজের পয়সায় কিনছি তোর 'ইয়ে'র কী?'

'তোর কী করে নিজের পয়সা থাকে কাজল, গঙ্গাপ্রসাদবাবু কি তোকে ঝি রেখেছেন? মাসান্তে মাইনে দ্যান?' —কাজলকে রাগাবার জন্যেই আমি কথাগুলোকে শানিয়ে নিই।

'আজ্ঞে না, তিনি আমায় ঝি রাখেননি, আমিই তাঁকে বাজার সরকার রেখেছি বলতে পারো' —রাগের মাথায় এ হেন কথা স্বামী গরবে গরবিনী কাজলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতেই আমরা সবাই হায় হায় হায় হায় রব দিতে থাকি। কাজল অবশ্য অত সহজে এল. বি. ডব্লু হবার পাত্র নয়। ক্রিকেট খেললে সুব্রত পোড়েল থেকে ডিকি বার্ড পর্যন্ত সব্বাইকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিত। সে বলে উঠল— 'ঝি-এর পরিপ্রেক্ষিতে যে চাকর বলিনি এর জন্যেই তোরা আমার শালীনতা জ্ঞানকে অভিনন্দন জানা। আমি রঞ্জুর মতো ভালগার নই, আসল কথা আমার সংসারে আমিই লক্ষ্মী, আমিই নায়েব, আমিই কেশিয়ার— উনি হলেন শিবের ট্রেজারার কুবের। মানে ক্ষমতায় নয়া স্টেটাসে। সবাই পেয়ে গেল পে-কমিশনের এরিয়ার, জ্যোৎস্নাবাবু পেলেন, পালিতবাবু পেলেন, গঙ্গাবাবু আর পান না। শেষে জেরা করে শুনি সেভেনটি ফাইভ পার্সেন্ট পেয়েছে, আমাকে না জানিয়ে গুচ্ছের ডিকশনারি আর কৃষ্ণমূর্তি কিনেছে। বাকি টোয়েন্টি ফাইভের জন্যে মুচলেকা দিইয়ে নিয়েছি।'

'তোর কর্তা আবার কৃষ্ণভক্ত হল কবে থেকে?' শ্রী মালবিকা উবাচ, 'কটা মূর্তি? ব্রঞ্জ না পেতল?'

'আমার কর্তা চিরকালই কৃষ্ণভক্ত ভাই,' কাজল এক টিপ ভাজা মৌরি মুখে

ফেলল, 'তবে এ কৃষ্ণ কদমতলায় বাঁশি হাতে-দাঁড়ানো সেই বাঁকা শ্যাম নয়।' শিল্পী সুযোগ বুঝে ইন নেয়, অহঙ্কারী গলায় বলে— 'কাজলদি জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির কথা বলছে মালবিকাদি, নাম শোনোনি?'

'জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তি? কৃষ্ণমূর্তি...রামমূর্তি...সাউথ ইন্ডিয়ান লাগে যেন?'

—'অ্যানি বেসান্টের দত্তক পুত্র গো, কী সুন্দর চেহারা, ছবি দেখোনি?'

'সুন্দর চেহারার রাইটার? বলিস কী? তবে তো দেখতেই হচ্ছে!' —মালবিকাদি এগিয়ে বসে।

শিল্পী গর্ব-গর্ব মুখ করে বলে, 'রাইটার না কি শুধু? ফিলসফার, লেখায় দাঁত ফোটাতে পারবে না। পারেন এক গঙ্গাপ্রসাদ জামাইবাবু আর পারে আমার বর।'

'তোর বর? মানে চন্নন? ও তো কমার্শিয়াল ট্রাভলার? ও আবার পড়বেই বা কী আর বুঝবেই বা কখন?'

বরের প্রতি কটাক্ষটা শিল্পী উপেক্ষা করে।

—'ম্যারিকায় কৃষ্ণমূর্তি এখন লেটেস্ট ক্রেজ তা জানো? প্রভুপাদ আস্তে আস্তে পড়ে যাচ্ছেন। জগদ্বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট ডেভিড বমকে...'

'ব্যোমকে দিয়েছিলেন, না কি?'

'দ্যাখো মালবিকাদি তেমার এই ইররেভারেনশ্যাল সুপারসিলিয়াস অ্যাটিটিউড আমার ভাল লাগে না—' শিল্পী সোফায় উঠে বসতে বসতে বলল, 'রঞ্জুদির হলেও সহ্য করতাম কেন না সে পাঁড় কমিউনিস্টের বউ।'

'কিন্তু আমি যে কমিউনিস্টের চাকরের বউ!' মালবিকাদির স্বামী বিকাশকান্তি সরকারি অফিসার।' শিল্পীও হেসে ফেলল।

'তা ম্যারিকায় যা যা ক্রেজ হবে সে গণেশ মূর্তিই হোক, আর ফাস্ট ফুডই হোক, আর চাইল্ড-অ্যাবিউজই হোক— সব আমাদের নিতে হবে? মানে তোকে আর তোর বর বরাটকে নিতে হবে?'

আমি দেখলুম আলোচনা আমার অভীষ্ট লক্ষ্যের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। আড্ডার ওলডেস্ট আর ইয়ংগেস্ট-এর মধ্যে একটা গজ-কচ্ছপ লেগে যেতে দেরি নেই। তাই তাড়াতাড়ি বললুম— 'কাজলের শাড়ি কেনা নিয়ে কথা হচ্ছিল কিন্তু। তোমরা প্রসঙ্গে ফিরে এসো। আমি বলছিলুম কি কাজলার এত শাড়ি কেনার দরকার কী? এগজিকিউটিভের বউ হত শিল্পীর মতো তো ঘন ঘন পার্টিতে যেতে দরকার হত। চাকরি করতে বেরোত তো মডারেট দামের অনেক শাড়ির দরকার হত, সুমিতার যেমন হয়। কিন্তু তুই ঘরের বউ, মেয়েটাও শাড়ি পরে না, তুই কেন শাড়িতে অত খরচ করবি?'

কাজল বলল— 'তোর যুক্তি হল আমার বর মাস্টার তাই তাকে কেউ সামাজিক কাজ-কর্মে সস্ত্রীক ডাকে না। ভাল। তো আমার কি গামছা পরে থাকা উচিত? ডবল গামছা— পরশুরামের সেই ভুষুণ্ডি মাঠের শাঁখচুন্নির মতো না পেতনির মতো? ভাল, না মরতেই শাঁখচুন্নি বানাচ্ছিস মরলে আমার বন্ধু

আমায় কী বানায় তোমরা সাক্ষী রইলে লক্ষ রেখো।'

আমি দেখি কাজলের যেটা স্বভাব, সুবিধেমতো সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে 'আহা কালো মেয়ে' করে করে জিতে যাওয়া— সেটাই চেষ্টা করছে।

তাই তাড়াতাড়ি বলি— 'ভাই, গামছা-টামছা অত কিছুই বলিনি, বলতে চাইছি অত শাড়ি তোমার না কিনলেও চলে। আমিই তো দু একখানা ভাল শাড়ি কিনে রেখেছি মাত্তর। দিদির মেয়ের বিয়েতে যে পাটোলাটা পরলুম বিধুভূষণ বাবুর মেয়ের বিয়েতেও সেই একই পাটোলা, তারপর যখন বিধুভূষণ বাবু তাঁর প্রকাশনা-সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব করলেন বই মেলায়, তখনও সেই একই পাটোলা...'

'শাড়ির ব্যাপারে যদি খোঁটা দিস তা হলে তোকে আর কখনওই শাড়ি ধার দোব না। আর তা ছাড়া শাড়ি ইজ মাই এগ্‌জিসটেন্স, মাই ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট ল্যভ। রুরুর কাছে যেমন প্রমদ্বরা, লায়লার কাছে মজনু, শেখরের কাছে ববি— এ বচপন নহি, এ মহব্বৎ। মরে যেতে বল না আমাকে তার চেয়ে, মরে যেতে বল।'

আমি বললাম— 'ঠিক আছে, জানা রইল শাড়িতে তোতে অচিন্ত্য ভেদাভেদ। একে গেলে যায় আর। মেনে নিচ্ছি। আচ্ছা শিল্পী...'

'আমায় আবার কী বলবে ? পেপার-ওয়েটটা কি পছন্দ হচ্ছে না ? তা হলে সুমিতাদির মুখোশটা তুমি নাও—'

'কী ফাস্ট। বাপরে বাপ ! হুড়োহুড়ি করে করমণ্ডল চলে গেল !'

'পেপার ওয়েটের নিকুচি করেছে। মুখোশ গোল্লায় যাক। আমি অন্য কথা বলছি।'

'কী কথা ? ব্যাঙের মাথা ?'

'আমি তোর মেয়ের কথা বলছি। মেয়েটা যে তোদের সঙ্গে সঙ্গে এই এক বার হংকং, এক বার সিঙ্গাপুর, এক বার মেক্সিকো করে বেড়াচ্ছে। ওর লেখাপড়া তো মাথায় উঠছে রে ! আমার কাছে রেখে দে না !'

'ওরে বাবা, আমার একমাত্র সন্তান, একমাত্র মেয়ে, একমাত্র বরের ঔরসে হয়েছে। ওকে আমি কাছছাড়া করতে পারব না। ও-ই বা ওর মামকে ছাড়বে কেন ? আর তোমার বাড়িতে ? তোমার নিজের সংসারেই তো ভাত ধরে যায়। দুধ উথলে যায়। তুমি চাইছ আমার মেয়েকে রাখতে ?'

সবাই হি-হি করে হাসে।

মালবিকাদি বলে— 'আপনি পায় না শংকরাকে ডাকে।'

'তোমার ছেলের কথাও ভাবো', শিল্পী আবার স্পিড দেয়। 'যতই শান্তশীল নাম দাও শান্ত তো সে মোটেই নয়, আমার মেয়েটাকে মেরে ধামসে দেবে।'

'কোনওটাই হবে না শিল্পী। আমার শেফালি আছে। সব দিক সামলাবে।'

শেফালি ঠিক এই সময়ে থালা ভরতি বেগুনি ফুলুরি পেঁয়াজি নিয়ে

ঢুকছিল। এই ভাজাগুলো ও খুব ভাল করে। আমার মুখে, 'সব দিক শেফালি সামলাবে' শুনে একেবারে গদগদ হয়ে উবু গেড়ে বসল। আবদেরে গলায় বলল— 'দাও না গো শিল্পীদিদি তুলতুলিকে আমাদের বাড়ি রেখে। একটা মেয়ে না হলে বাড়ি মানায় ? কেমন ঝালর ঝালর ফ্রক শুকোবে, ফিঁতে, ক্লিপ-পুঁতুল, আমি ওর স-ব করে দোব। আর শান্তদাদা ? একটু দুষ্টু আছে বটে, কিন্তু মেয়েছেলেদের কিচ্ছু বলে না।'

শিল্পী বলল, 'তা না হয় হল, কিন্তু যদি প্রেম হয়ে যায় ?'

সুমিতা বলল, 'ঠিক, বাল্যপ্রেমে অভিশাপ আছে। তবে শিল্পী, ওই উপন্যাসেরই নজির ধরলে তোর মেয়ে শান্তটাকে ডোবাবে, নিজে ডুববে না, ডুবে ডুবে জল খাবে।'

আমি খুব বিরক্ত হই। 'দিনকাল কি এক জায়গায় থেমে আছে নাকি ! যদি প্রেম হয়েই যায়, হবে না, তবু যদি হয়েই যায় আমার শান্ত কি খারাপ পাত্র ? আমি কি খারাপ শাশুড়ি ? আমার বর কি খারাপ শ্বশুর ?'

'সে কিছু বলা যায় না আগে থেকে রঞ্জুদি, শাশুড়ি যতক্ষণ না হচ্ছ, ততক্ষণ বোঝা যাবে না তুমি কী শাশুড়ি হয়ে দেখা দেবে। তখন আমাদের রিলেশন স্ট্রেইন্‌ড্ হয়ে যাবে, এমন আড্ডা আর জমবে না।'

সুমিতা একটা পেঁয়াজি মুখে ফেলে বলল, 'এক যে ছিল সওদাগর।'

মালবিকাদিও কামড় দিল ফুলুরিতে, —'তার ছিল এক বউ।'

'তাদের কোনও ছেলেমেয়ে ছিল না,' আমি জোগান দিই।

কাজল বলে— 'একদিন খুব ঝড়ে সওদাগরের বাগানের একটা গাছ পড়ে গেল। সওদাগরের বউয়ের কান্না তাইতে আর থামে না।'

শিল্পী বলল, 'আহা, এ গল্প কে না জানে। যদি তার ছেলে থাকত, সে যদি ঝড়ের সময়ে গাছের তলা দিয়ে যেত, তা হলে গাছ চাপা পড়ে তার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হত সেই মনে করে...'

মালবিকাদি বললে, 'নে একখানা ফুলুরি নে। জানিস তা হলে ? তোর কথার ধারা দেখে মনে হচ্ছিল জানিস না। আরও মনে হচ্ছিল ওই সওদাগরের বউ তোর মাসতুতো বোন।'

শিল্পী বোকার মতো হেসে বলল— 'কেন ? কেন ?'

আমরা আবার 'হায় হায়' করতে থাকি। আর শেফালি হেসে কুটিপাটি হয়ে তাকে জ্ঞান দেয়— 'বুঝলে না শিল্পীদিদি, যদি তুলতুল আমাদের এখানে থাকে, যদি শান্তদাদার সঙ্গে তার মহব্বৎ হি মহব্বৎ হয়ে যায়, যদি আমাদের বউদি, বউ-কাঁটকি হয় তবে তোমাদের আড্ডা...'

শিল্পী রেগে বলল— 'যা যা, কোথাকার জ্ঞানী এলেন রে, যাও তো মিস সক্রেটিস ঘরে যাও। অ্যাভোক্যাডো এনেছি এবার ওদের জন্যে। ছুরি টুরি বার করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে এসো...'

'বাপের জন্মেও আমি সক্রেটি ছিলুম না'— শেফালি ক্ষুব্ধ হয়ে বলে 'বাপের

পদবি ছিল করাতি। নাম উল্টো-পাল্টা বললে বেড়াল কুকুরেও ফ্যাঁচ করে। তবে আমরা তো বেড়াল কুকুরেরও অধম'— ফোঁস ফোঁস করছে, কাঁদবে না কি ?

আমি দুখানা ফুলুরি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলি— 'বড়দের পাকা পাকা কথার মধ্যে থাকিস কেন বাবা। ঝিঁকুটি হয়ে যাবি যে।'

'দ্যাখো বউদি। পেটে সে সন্তান দ্যায়নি তাই। দিলে পরে পাঁচি পাঁচ ছাগলের মা হয়ে যেত।' —শেফালি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

শিল্পী বললে— 'স্যরি রঞ্জুদি, তোমার একখানা গ্রহশান্তি করাতে হবে মনে হচ্ছে।'

সুমিতা বলল— 'ঠিকই। সন্তানকামনা যদি ওর খুব উদগ্র হয়ে ওঠে তা হলে ও সন্তানের সম্ভাব্য পিতার খোঁজে ঘুড়ির মতো কেটে যাবে। এটা আটকানোর জন্যেও তুই তুলতুলকে কদিনের জন্যে ধার দে।'

'ছাড়িব না, ছাড়িব না'— শিল্পী বুকে কাল্পনিক তুলতুলকে চেপে ধরে গান গায়।

আমি দুম করে বলি— 'তা হলে সুমিতা, তুই তোর ওই লিভ-টুগেদারের পার্টনারটা ছাড়।'

'মানে ? তুলতুলের বদলে শুভম ? তুই শুভমকে শেফালির জন্যে চাইছিস ? আমার নিজস্ব সাত-পাঁকে-বাঁধাকে তুই লিভ-টুগেদারের পার্টনার বলছিস ? শুভম, শুভম, তুমি কোথায় ?'

'আহা হা শুভমকে আমি কারও জন্যেই চাইনি। শেফালির তো প্রশ্নই ওঠে না। স্রেফ ছাড়তে বলেছি। বছরে ছ মাস তো ছেড়েই থাকিস— তুই ডাঙায় চরিস, সে জলে ভাসে— একে লিভ-টুগেদার বলে না তো কী ?'

মালবিকাদি ফুলুরিতে এক কামড় মেরে বলল— 'দেশে দেশে মোর বউ আছে আমি সেই বউ মরি খুঁজিয়া।'

'ভাল হচ্ছে না কিন্তু'— সুমিতা খুব রেগে যায়। ওর বর মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করে বলে বিরহে মিলনে ওরা বেশ মজে থাকে। দুজনেরই খুব ফ্রিডম— ফলে অটুট বাঁধন— সুমিতার ধারণা।

কাজল বলল— 'পেঁয়াজিটা দারুণ করেছে কিন্তু শেফালি। আমার হাতে কিছুতেই এমন হয় না কেন বল তো ?'

মালবিকাদি বলল, 'তুই কি পেঁয়াজি গড়তে গড়তে নাক খুঁটিস।'

'এ মা ছি ছি', হাতের পেঁয়াজিটা কাজলা মালবিকাদির মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। মালবিকাদি মাথাটা ঝট করে সরিয়ে নিতে সেটা ল্যান্ড করল শিল্পীর ঠোঁটে।

যেন আরশুলা বসেছে এমন ভয়ে শিল্পী লাফিয়ে উঠে পেঁয়াজিটাকে চটি দিয়ে থেঁতলে দিল তারপরে নাকি সুরে বলল— 'আঁমি পেঁয়াজি খাঁব নাঁ।'

'তবে ফুলুরিটা খা, একগাল মুড়ি দিয়ে', একটা ফুলুরি তুলে নিয়ে মালবিকাদি

সাধতে লাগল ওকে— 'ফুলুরিটা ও খুব শুদ্ধভাবে করে। খুব পবিত্র ফুলুরি, না রে রঞ্জনা ?'

আমি রেগে বলি— 'খাওয়াটা শুধু শুধু মাটি করে দিলে মালবিকাদি, এই জন্যে তোমাকে আমি ডাকতে চাই না। স্রেফ মহিলা সমিতির বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি টেবল ক্লথ, টেবলম্যাট আর কাঁথাগুলোকে বেশি দামে গছাবার জন্যে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ভিড়ে আছ।'

'আহা, কী আমার বাছুর রে।' মালবিকাদি আমার থুতনির কাছে আঙুল নেড়ে নেড়ে বলল, 'রঙিন রঙিন কাপড় পরলেই বয়ঃ থেমে থাকে, না ? জানিস তোদের বয়সে আমার ঠাকুমা নাতি-নাতনি পরিবৃত হয়ে স্বর্গে গেছিলেন ? বা-ছুর !'

বেগতিক দেখে কাজল মধ্যস্থ মানে বলে— 'এই দ্যাখ পেঁয়াজি ফুলুরি দুটোই আমি খাচ্ছি, অ্যানট্যাসিড রেডি। তুই শান্ত হ শান্তশীলের মা। মালবিকাদির কেচ্ছা করা স্বভাব। আমি বিশ্বাস করিনি। প্রথমটা রি-অ্যাক্ট করেছিলুম ঠিকই। কে-ই বা না করবে একমাত্র আমার ডিকশনারি-পাগল বর ছাড়া ? তা ছাড়া কথা হচ্ছিল রঞ্জুর উপন্যাসের প্লট নিয়ে। মালবিকাদি এর মধ্যে তোমার ঠাকুমা, তাঁর নাতি-নাতনি, স্বর্গ বাছুর এ সব আসে কী করে ? আমরা সবাই মিলে রঞ্জুকে লেখাটা ছেড়ে দিতে বলেছিলুম এই তো কথা !'

আমি বলি— 'ছাড়িব না, ছাড়িব না', শিল্পীর মতো সুর করেই বলি, 'মালবিকা সান্ডেল যদি পান-জর্দা না ছাড়ে, কাজলরেখা মিত্তির যদি-শাড়ি কেনা না ছাড়ে, আমিও তা হলে লেখা ছাড়ব না।'

সুমিতা বলল 'আমার ধারণা ছিল তুই একজন সৎ-লেখক। মানে ইনটেনশনের দিক দিয়ে সৎ। কিন্তু ছিঃ ! লেখাটা তোর একটা নেশা একটা শখ, পান-জর্দার মতো ? শাড়ির মতো !'

'লেখা আমার সন্তানও। শিল্পী কি তার তুলতুলকে দুদিনের জন্যেও ছাড়তে পারছে ? লেখা আমার প্রিয়তমও। তুই কি তোর শুভমকে ছাড়বার কথা ভাবতে পারছিস ?'

এতক্ষণে আমার ফেলা জাল গুটোনো হয়। বিজয়ীর দৃষ্টিতে আমি সবার দিকে তাকাই।

সুমিতা বলল— 'লেখার সঙ্গে বাচ্চার তুলনা, বরের তুলনা এগুলো টু মাচ রে রঞ্জুদি, টু মাচ।'

'টু মাচ ! আমি তো মনে করি কম বললুম। প্রেমিকদের প্রেমের মধ্যে সেই প্রেরণাদায়ী শক্তি তো ক'বছরের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। থাকে বড় জোর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আর সন্তান ? সে তো শ্যাম শুক পাখি, আঠারো-উনিশ কি কুড়ি, তার পরেই শিকলি কেটে উড়ে যাবে তোমায় দিয়ে ফাঁকি। এদিকে লেখা ! সে হল...'

মালবিকাদি কি কোনও কথা শেষ করতে দেয় ? বলে উঠল— 'শাশ্বত,

ফেইথফুল, তার প্রেমে তার ভক্তিতে ভাঁটা পড়ে না, কখনই সে ব্রজধাম ত্যেজে মথুরা যায় না। তুই লিখে যা রঞ্জু, লিখে যা। খালি প্লট চেয়ে আমাদের লজ্জা দিস না।'

মালবিকাদি জোড়া পান মুখে পুরল। শেফালিও বিশাল এক পট চা দিয়ে গেল।

'লিখবে তাতে লজ্জার কী আছে? কথায় বলে লেখা পড়া করে যে-ই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে-ই। আমাদের বউদি তো তাই-ই করছে—' শেফালি উবাচ।

'লিখে তো আমি যাবই'— আমি বলি— 'আমার ফীলিং আমার কাছে। কিন্তু কথা হচ্ছিল আমি নাকি অস্থির, আমি নাকি খ্যাপা। আমাকে দিয়ে সেই জন্যে নাকি উপন্যাস হবে না। কেন? ঠিক আছে অস্থির। তা অস্থিরতার সঙ্গে খ্যাপামির সঙ্গে উপন্যাসের ঝগড়া কোথায়?'

'উপন্যাস একটা বিশাল বিরাট সাগরের মতো ব্যাপার। সেটা ধারণ করতে একটা শা-স্ত ধীর মস্তিষ্কের দরকার হয়। যেমন ধর 'বাডেনব্রুকস', 'ব্রাদার্স কারমোজোভ', 'ডক্টর জিভাগো'—কি ধর এই তো ঘরের কাছেই 'ইছামতী', 'ধাত্রীদেবতা', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'— মালবিকাদি বলে।

'অদ্ভুত অদ্ভুত নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্সও দরকার হয় রঞ্জুদি'— শিল্পীটা আবার ফুট কাটল— 'এই ধরো আমরা যে সে বার টোকিও গেলাম। হোটেলের এক দিকটা দেখি একেবারে খোলা। নীল সমুদ্র। তাতে বোট ভাসছে। ভাবলুম সুন্দর তো ঠিকই। অপূর্ব। কিন্তু এমন অদ্ভুত প্ল্যান কেন ওদের মাথায় এল, একটু ভাবতেই বুঝলুম এটা ওদের জাতীয় প্রথার কথা মনে করে করা হয়েছে। হারাকিরির জাত তো জাপানিরা, তাই আত্মহত্যার সুবিধে করে রেখেছে। যে কোনও ফ্লোর থেকে ঝাঁপ খেলেই হল। ওমা। পরে শুনি কাচ। হোটেলের এক দিকটা পুরো কাচের। এই যে তাইল্যান্ডে গেছিলাম, একটা জায়গার নাম অযোধ্যা— ধরো সেইটেই যদি আসল অযোধ্যা হয়! তাই-রা ইংরেজি ভাষাটার পরোয়াই করে না। নিজেদের ভাষাতেই সব কাজ চালায়, ওদের বেশির ভাগ ফ্ল্যাটেই রান্নাঘর নেই। বাইরে খাওয়াটাই রীতি। তুলসীপাতা দিয়ে মাংস রাঁধে, কখনও শুনেছ? অত কথা কী! আমাদের দেশেই কত অদ্ভুত অদ্ভুত কাস্টম আছে। আমরা যেমন সোফা-কৌচ কি চৌকিতে বসি, গুজরাতে তেমন গেস্ট এলে দোলনায় বসায়। তাকে বলে হিঁচকো। ওরা মিষ্টি দিয়ে খাওয়া শুরু করে তেতো দিয়ে শেষ। ওদের বাড়ির মেয়েরা বসে থাকতে জানে না। যত বড়লোকই হোক খেটেই যাবে, খেটেই যা...'

'তুই থামবি শিল্পী?' কাজল বলল— 'রঞ্জু কি তাইদের নিয়ে উপন্যাস ফাঁদবে? না গুজরাতিদের বিষয়ে এসে লিখবে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকস-এর জন্যে? ওপর থেকে দেখে ফিকশন লেখা যায় না। আমার বর বলে কনর‍্যাড আর মম্ দুজনেই মালয় নিয়ে গাদাগুচ্ছের লিখেছিলেন। আঁতেলদের কাছে

কনর‍্যাডের খাতির বেশি। কিন্তু মম্ ক্লেইম করতেন কনর‍্যাড জাহাজ থেকে মালয়কে দেখেছেন ওঁর মালয় কল্পনার মালয়, এদিকে মম্ চলে গেছেন ভেতরে, বাস করেছেন অন্ততপক্ষে ব্রিটিশ সরকারি অফিসার কি প্লানটেশনের মালিকদের সঙ্গে।'

'তুই থাম কাজলদি?' সুমিতা কাজলকে থামায়— 'আসল হল— মন, মানুষের মন, মনকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ইনসাইড আউট আবার পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো পরতে পরতে জানতে হবে। সাইকলজি। দোমিনিক লাপিয়েরও তো পিলখানার বস্তিতে বাস করেছিলেন শুনতে পাই। কিন্তু কলকাতার মনের ভেতর কি ডুব দিতে পেরেছেন? মুনের ব্যাপারটা সায়েন্টিফিক্যালি জানতে পারলে, ফিলসফিক্যালি ফীল করতে পারলে, আর আর্টিসটিক্যালি পুট করতে পারলে একটা কাফকা হয়, একটা কামু হয়, একটা রবীন্দ্রনাথ হয়, একটা মানিক হয়...'

মালবিকাদি আরেক জোড়া পান মুখে পুরে বলল— 'আর একটা সুমিতা হয়।'

সবাই হেসে উঠল। সুমিতা গোমড়া মুখে বলল— 'আমি তো এক বারও ক্লেইম করিনি আমি সবজান্তা, কি আমি সব পড়েছি, কি আমি একটা পোটেনশিয়্যাল লেখক... কি আমি...'

'থাম থাম'— আমি হাত তুলে সবাইকে থামাই— 'তা হলে তোমরা সবাই স্বীকার করছ এই যে সব বিভিন্ন লেখক এবং তাঁদের লেখার কথা তোমরা উল্লেখ করলে, সবাই ঔপন্যাসিক, লেখাগুলোও সব উপন্যাস?'

'অত শত জানি না ভাই, সেই বি-এ ক্লাসে পড়েছিলুম 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস না রোম্যান্স, নারায়ণ গাঙ্গুলি আবার বলতেন রমন্যাস, আর এখন নিত্যদিন আমার বর কচকচ করে মার্কেজ, মার্কেজ, মিরেন্দা না কুরেন্দা, আর 'মাল্যবান' আর 'কারুবাসনা'? তাই কটা নাম জানতে বাধ্য হয়েছি। উপন্যাস হবে একখানা জমজমাট গপ্পো। এক দিনে শেষ হবে না, অনেক দিন ধরে পড়তে হবে, পড়তে পড়তে কেঁদে কেঁদে উঠবো যেমন 'রাত্রির তপস্যা' রেগে রেগে উঠব যেমন 'হাজার-চুরাশির মা', দীর্ঘশ্বাস ফেলব যেমন 'গৃহদাহ', যেমন 'বীজ' তবে না?'

'তা 'বীজ'-এ সে সেনস-এ তেমন গল্প কোথায়? সবটাই তো একটা নিষ্ফল প্রতীক্ষা? 'বীজ' যেমন 'হাজার চুরাশির মা-ও তেমন কয়েক ঘণ্টায় পড়া হয়ে যায়, 'কাস্‌ল'-এ তো কোনও গল্পই নেই, পাতলাও তার ওপর। এদিকে 'সোয়ানস ওয়ে' এত বড় বড় ভল্যুম, 'ওয়র অ্যান্ড পীস' দু খণ্ড, 'ফরসিথ (চার্লস নিউটনের উচ্চারণে) সাগা' তিন খণ্ড—'

—'আমি ভাই পড়িনি। আমার বর পড়ে থাকতে পারে, এ বার ক্ষ্যামা দাও। আমার বিদ্যেয় আর ঘা দিয়ো না। সত্যি কথা বলতে কি আমার বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, আশাপূর্ণা দেবী, প্রবোধ সান্যাল, আর ইদানীং-এর মধ্যে

বুদ্ধদেব গুহ আর শীর্ষেন্দু এই ভাল লাগে। আর সমরেশ মজুমদার। দীপাবলীকে কী সুন্দর শেষমেষ বরের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন !'

'তা তোমার এই শীর্ষেন্দুই তো সুদ্ধ ডায়লগ দিয়ে একটা উপন্যাস দাঁড় করিয়ে দ্যান। বুদ্ধদেব গুহ লিখলেন বাচ্চা বাচ্চা চরিত্র নিয়ে কিন্তু লেখাটা একেবারে অ্যাডাল্ট। শরৎচন্দ্রের সব ভাল কিন্তু সব্বাই ওঁর প্রেমে পড়ে যাচ্ছে রাজলক্ষ্মী, কমললতা, অভয়া + আর উনি তাদের কাটিয়ে কাটিয়ে বেরিয়ে আসছেন। তোমার ভাল লাগার ভিত্তিটা ব্যাখ্যা করো। আমি তো কোনও মিল পাচ্ছি না।' —আমি বলি।

'অত যদি ব্যাখ্যা করতে পারব তো গঙ্গাপ্রসাদ না হয়ে আমিই তো সিটি কলেজে লেকচার দিতে যেতে পারতুম।'

শিল্পী বলল— 'তোমার মানিক ভাল লাগে না ? সতীনাথ ভাল লাগে না।

'মানিক ভাল্লাগবে না কেন ?' কাজলের উত্তর রেডি— "সোনার কেল্লা', 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' দিব্যি লাগে। আর 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' তো যত বার দেখাবি দেখে যাব, এক সিটিং-এ। ভূতেদের নামা, আর ভূতের রাজার বর, আর মরুভূমির মধ্যে দিয়ে ওস্তাদি গান গাইতে গাইতে রোগা রোগা ওস্তাদ আর 'ছুটি ছুটি ছুটি ছুটি ছুটি ছুটি'... আর 'ভাই রে।' আর চেঁচাইছিলি ক্যানে ?" কাজল প্রায় প্রত্যেকটা অ্যাকশান করে করে দেখাল 'ছুটি ছুটি'টা ছাড়া !

তারপর বলল— 'সতীনাথও আমার খুব প্রিয়। আমাদের ছেলেবেলাকার গান সব। 'বালুকাবেলায় কুড়াই ঝিনুক...।' 'পাষাণের বুকে লিখো না আমার নাম' —এ সব কি ভোলবার ? একটু চাপা চাপা ছিল গলাটা ডি. ভি. পালুসকরের মতো, যেন বিরহের ভারে চেপে গেছে, কিন্তু কী দরদ, সত্যি রে, তখন আমাদের ধারণা ছিল সতীনাথের বিয়ের পরেই নতুন বউ মারা গেছেন।'

'আর হাসাস নি কাজলা'— মালবিকাদি পেট চেপে বলল।

'তুমি সতীনাথের "না যেও না"টা ভাবো মালবিকাদি, তুলনা আছে ? লতার "না যেও না"-ও ভাল, কিন্তু সতীনাথের পাশে ফক্কিকারি। রবীন্দ্রনাথের "না যেও না"টা অবশ্য আলাদা জাতের। তবু আমার মতে সতীনাথ ফার্স্ট, রবীন্দ্রনাথ সেকেন্ড। রবীন্দ্রনাথ বলে কি ছেড়ে দেব নাকি ? আমার কাছে বায়াস পাবে না।'

কাজলাটাকে নিয়ে আর পারি না ! গীতিকার গায়ক লেখক সব লণ্ডভণ্ড করে ছেড়ে দিচ্ছে সে-কথা বলতে কাজল চিবুক ঘুরিয়ে বলল— 'পস্ট কথা বলব বন্ধুদের কাছে এর মধ্যে আবার ঢাক-ঢাক গুড়গুড়-এর কী আছে ? আসত আমার বরের জ্ঞান গোঁসাই বন্ধুরা নানা রকম ভান ভনিতা করতে হত। "সুটেবল বয়", "সুটেবল গার্ল", হারমোনিয়মের বেলো, সল বেলো, হেনরি মিলার নাদিন গর্ডিমার— এই সব সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করতেন আর আমাকে এক বার বাঁ দিকে হেসে একবার ডান দিকে হেসে সন্তুষ্ট করতে হত।

এখন তো বলছি তোদের কাছে, যা যা বেস্ট লাগে বলে দিলুম বাস।'

আমি বললুম— 'আসল কথা যে যাই বলো, উপন্যাসের কোনও...'

'মা-বাপ নেই' মালবিকাদি পান চিবোতে চিবোতে বলল,

—'মোটেই আমি তা বলতে চাই না, তোমরা বড্ড গুলিয়ে দাও,' আমি ভীষণ বিরক্ত।

'দুঃখিত রে, আমি ভাবলুম তুই একটা বড় লেকচার দিবি কাজলার মতো, মুডে আছিস তো, তাই একটু শর্ট করে দিচ্ছিলুম।'

শেফালি আর এক রাউন্ড চা আর চেতল মাছের বড়া নিয়ে ঢুকল।

"আমি বলতে চাই— উপন্যাস ইতিহাস, উপন্যাস রোম্যান্স, উপন্যাস বেলুন ফোলানো ছোটগল্প, উপন্যাস ছোট ছোট গল্পের সমাহার, উপন্যাস নাটক, উপন্যাস বক্তৃতা, উপন্যাস কবিতা,... উপন্যাস যা খুশি হতে পারে, যত খুশি। ধরো লরেন্স স্টার্ন, জেমস জয়েস, গোগোল, এঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন উপন্যাস কত রকম হতে পারে। ধরো 'প্রথম আলো' যে-অর্থে উপন্যাস 'মুক্ত পুরুষ' কি সেই অর্থে উপন্যাস ? 'দিবারাত্রির কাব্য' যে অর্থে উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' কি সেই অর্থে উপন্যাস ? 'দেবযান', 'ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচুড' দুটোই ফ্যানটাসি-ভিত্তিক, অথচ কত আলাদা !"

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাক একটি উপন্যাস' সুমিতা মাথা নেড়ে নেড়ে কুট কুট করে বলে উঠল।

'মতটা দিলি তা হলে ? তোদের অনুমতি ? আমার উপন্যাস হয়তো তোদের মতে ওপন্যাস হবে, তবু তা আমি লিখে ফেলব। ফেলবই ফেলব। তোরা শুধু আমায় প্লট দে।'

শিল্পী আর মালবিকাদি এক মনে চেতল মাছের বড়া সাঁটাচ্ছিল, শিল্পী বলে উঠল "অন্ন দে মা অন্ন দে' বলে চেঁচালে তবু অন্ন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু 'প্লট দে রে প্লট দে' বলে চেঁচালেই কি আর প্লট দেওয়া যায়। প্লট কি আর আমাদের নেই ?—তবে সে সব বড্ড পেরাইভেট।'

'তুই প্লটলেস লেখ বরং'—মালবিকাদি উপদেশ দেয়।

'হেবভি গান "অন্ন দে" শেফালি মন্তব্য করে, তবে "পেলট দেরে" বলে কোনও গান আমি বাপের জন্মে শুনিনি। আর পেলট তো তোমাদের থাকবেই গো শিল্পীদিদি। এক কাটা দেড় কাটা হলেও তো লোকে কিনে রাখছে। ও-ই দু দশ বছর পরে দশ ডবল দামে বিকোবে। লোকে তো আজকাল এই করেই টাকা করছে। থাকে যদি তো বউদিকে একটা দাওই না কেউ। নেয্য দাম দেবে। আমাদেরই কপাল !' বলে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে শেফালি চলে গেল।

মালবিকাদি বলল—'যাক এখনকার মতো ফাঁড়া কাটল। তা রঞ্জু তুই সুমিতার পার্ট-টাইম বরকে নিয়ে লেখ না ! অমন একটা চিরবিরহের জীবন। তার ওপরে কালারফুল !' এখনও ও সুমিতার পেছনে পড়ে আছে।

সুমিতা বলল—'কে কালারফুল, কে নয়, সেটা তিনের একের এ যাদু ঘোষের লেনে বসে তো বলা যাবে না। মাঠে নামতে হবে। তোমার বরকে নিয়েও তো লিখতে পারে ?

—'আমার বর ?'—মালবিকাদি হেসে কুটিপাটি হয়ে গেল। বয়স ষাট ছুঁই-ছুঁই, পার্ফেক্ট ভুঁড়ো শেয়ালের মতো চেহারা। চুলগুলো যেন কাঁটালের ভূতি মেখেছে। হাসালি !'

'আই চ্যালেঞ্জ'—সুমিতা হাঁটু চাপড়ে বলল।

'কীসের চ্যালেঞ্জ বোনটি ?'

সুমিতা বলল—'বরেদের তোমরাই আলু-পটল-কুমড়োর জগতে, রাতে-নাক-ডাকা দিনে-আপিস আর টিফিন-কৌটোয়—আলুমরিচের চার দেওয়ালে বন্দি করে রেখেছ। তোমাদের অ্যাটিটিউড হল সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, রোম্যান্সের চেয়ে সিকিওরিটি ভাল, ওদের তোমরা আড্ডা মারতে দাও না, তাস-দাবা খেলতে দাও না। একলা কি অন্য কারও সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার-নাচ-গান যেতে দাও না। ফুচকা খেতে দাও না। অন্য মেয়ের সঙ্গে মিশতে দাও না, পাছে বর তার প্রেমে পড়ে যায়, মানে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই নিজের ওপর, নিজের জীবনসঙ্গীর ওপর।'

'প্রশ্নই ওঠে না, প্রশ্নই ওঠে না'—মালবিকাদি বললে—'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে এখন আবার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কী ?'

কাজলা বলল—'আমি ভাই আমার বরকে বেঁধে রাখিনি। সে নিজেই গোঠের গোরু টাইপের।'

শিল্পী বলল—'আমি সব সময়ে শর্মিলা-সঞ্জীবের 'গৃহপ্রবেশ'টা মনে রাখি। নিজের লাইফের সিক্রেটটা তোমাদের বলে দিচ্ছি। ড্রেস আমার আছে হাজার রকম। চুল ভগবান অনেকটা দিয়েছেন। হেয়ার-স্টাইলও আমার বহু রকম। তোমরা নিজেরাই তো বলো রন্ধনে আমি দ্রৌপদী। তুলতুলকে যতটা মনোযোগ দিই চন্দনকে তার কম দিই এ কথা শত্রুতেও অর্থাৎ শাশুড়িতেও বলতে পারবে না। আবার সব সময়ে যে সেঁটে থাকি তা-ও বলতে পারবে না কেউ। এই তো ঈজিপ্ট গেল আমি যাইনি, ম্যানিলা গেল আমি যাইনি।'

আমি বলি—'তা হলে তুই বাহ্যাড়ম্বরে বিশ্বাস করিস ? তোর ড্রেস আর চুলের স্টাইল আর রান্নার তরিবত এই দিয়ে তুই চন্দনকে ভুলিয়ে রাখতে চাস ?'

'বাহ্যাড়ম্বর কেন হবে ?' শিল্পী বলল—'ভেতরে ল্যাভ তো আছেই। বাইরের ব্যাপারগুলোকেও আমি উপেক্ষা করি না। রিস্ক নিয়ে কী লাভ ? কেন সেই "প্যাভিলিয়ন অফ উইমেন"-এ পড়োনি, চিনা বাড়ির সুন্দরী গিন্নি মাদাম উ তাঁর মেজ বউ মেজ ছেলের মধ্যে গোলমাল দেখে শেষ পর্যন্ত মেজ বউকে ডেকে বিশেষ একটা পারফ্যুম মাখতে পরামর্শ দিলেন, আরও কী কী সব শেখালেন,—এগুলো প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার কেউ বলে কেউ বলে না।'

'তা হলে তো দেখা যাচ্ছে নিরুপম গড়াই ভীষণ ভালনারেবল।' আমি চিন্তিত হয়ে বলি 'রান্নায় আমি মা, সংসার দেখে শেফালি, শান্তর বাবার চেয়ে শান্তর প্রতিই আমার বেশি মনোযোগ। অর্ধেক দিন চুল বাঁধতে ভুলে যাই। বাড়ির শাড়ি একটা না ছিঁড়লে আর একটা বার করি না...'

শিল্পী বলল 'নট নেসেসারিলি। তোমার অত ঘাবড়াবার কিছু নেই। তবে নিরুপমদা তো পলিটিক্স নিয়ে মেতে আছেন, নইলে তোমাকে চুল বাঁধতেই হত, একটা দুটো ভাল-মন্দ রাঁধতেও হত।'

সুমিতা বলল—'আমার মধ্যে আমার শুভমের মধ্যে কোনও অভাববোধ, কোনও অবিশ্বাস, কোনও হিংসুটিপনা নেই। এখন "কালারফুল" কথার মানে কী ? সেটা আমাকে এক্সপ্লেইন করো।'

আমি বলি—'বহুমুখী ব্যক্তিত্ব, লাইভলি, জলি।'

'তাই যদি হয় তো ঠিক আছে, কিন্তু মালবিকাদি একটা কোনও নিজস্ব বাজে অর্থে কালারফুল কথাটা ব্যবহার করেছে।'

'না, না, মোটেই না'—মালবিকাদি হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'রঞ্জু যা বলেছে ঠিক বলেছে। আমি তার চেয়ে এক চুল বেশি বা কম বলিনি। আফটার অল, রঞ্জু লেখে-টেখে, শব্দ নিয়ে ওর কারবার। ও যতটা গুছিয়ে বলতে পারবে আমরা তো ততটা...।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে'—সুমিতা বলে, 'কতটা কালারফুল আমার শুভম তুমি পরীক্ষা করো না, আমি মাঠ ফাঁকা করে দিচ্ছি। শুভম পরশুর পরের দিন পৌঁছচ্ছে। ওই সপ্তাহটা হয়তো আমাদের নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকবে। তারপর আমারও কলেজ, রিসার্চ, মেয়েদেরও স্কুল, পরীক্ষা, বলছি তো ফাঁকা মাঠ।'

আমি একটা প্লটের আঁচ পেয়ে যাই, বলি 'তা শিল্পী তুইও দেখ না নিরুপমদাকে বেশ রসিক করে তুলতে পারিস কি না। তার মধ্যে অভাববোধ আছে কি না। নাকি তার রংচং আমি আমার ধূসর দিয়ে ঢেকে রেখেছি।'

শিল্পী বলল—'তা হলে সবাই নেমে পড়ুক। কাজলদির সঙ্গে তো চন্দন স্কটিশ চার্চে পড়ত। ঝালিয়ে নিক পুরনো ভাবটা।'

কাজল গোঁয়ারের মতো বলল 'আমি এ সবের মধ্যে নেই ভাই। আমার বর সিরিয়াস ধরনের মানুষ। টের পেলে রেগে গুম হয়ে যাবে। চন্দনের সঙ্গে ভাব ঝালিয়ে নেওয়াটা কোনও ব্যাপার না, সে আসুক, যাক, যেমন আমার ছেলের বন্ধুরা, বরের বন্ধুরা আসে যায়...কিন্তু...'

মালবিকাদি বলল 'তা হলে তো প্রমাণই হয়ে গেল তুই গঙ্গাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিস, ঠিক যা যা সুমিতা বলছিল। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ। তা হলে তুই মেনে নে তুই হেরে গেছিস। ম্যাচ ছেড়ে দেবার মতো আর কী ! ওয়াক ওভার দিয়ে দে। হেরে যাবার চিহ্নস্বরূপ তুই তোর সী-গ্রিন ঢাকাইটা রঞ্জুকে দিয়ে দে। একখানা পাটোলা ছাড়া বেচারির আর কিছু নেই...'

'ঠিক আছে।' কাজলা বলল, 'ঢাকাইয়ের চেয়ে বরং রঞ্জু আমার বরটাকেই

নিয়ে নিক।'

'আমি এর মধ্যে নেই।' আমি ক্ষুব্ধ হয়ে বলি। 'নেওয়া-নেওয়ি আবার কী ?'

'নেওয়া-নেওয়ি নয়, আবিষ্কার করা' সুমিতা বলল, 'নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করা পুরনো পৃথিবীতে...'

উপন্যাসটা মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত সুমিতাই লিখবে। 'কিন্তু কীভাবে জানা যাবে যে আমরা সব কলাম্বাস, আমেরিগো ভেস্পুচি, আমুন্ডসেন ?'—শিল্পী জিজ্ঞেস করল 'স্টাডি করে তো বলতেই পারি নিরুপমদা আসলে ভীষণ ভীষণ দুঃখী। মানুষটা বাপ-মায়ের কাছেও তেমন স্নেহ-ভালবাসা পায়নি, রঞ্জুদিও যত্ন আত্তি করে না। দুঃখের চোটেই ও নেতা হয়ে গেছে। কিংবা রঞ্জুদিও তো বলতে পারে গঙ্গা জামাইবাবু ডিকশনারিবাজ নয় আসলে ধড়িবাজ, শান্তিনিকেতনে অত ঘড়ি-ঘড়ি যান কেন ? না রিয়্যাল এস্টেট প্রমোট করতে। বেনামিতে...'

কাজল একটা কুশন তুলে নিয়ে শিল্পীকে, ধমাদ্দম পিটতে লাগল। 'আমার সেইন্টলি বরকে তুই ধড়িবাজ বললি ?'

'যাক বাবা, আমি ধড়িবাজ বলেছিলুম বলে তো তুমি সেইন্টলি বলে স্বীকার করলে।'

হাসতে হাসতে আমাদের সব চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে।

যাই হোক, ঠিক হল, কারও মুখের কথায় শুধু বিশ্বাস করা হবে না। সঙ্গে খান তিনেক সই করা রেস্তোরাঁর বিল চাই, অন্তত একটি সিনেমা বা থিয়েটার বা যে কোনও অনুষ্ঠানের টিকিট। সুমিতা নাকি সব্বাইকে মানে যে যে লস্ট কন্টিনেন্ট আবিষ্কার করতে পারবে তাকে তাকে একখানা করে শ্যানেল নং-ফাইভ দেবে। সুমিতা যদি পারে তবে সুমিতাকে আমরা সবাই মিলে একটা ঢাকাই প্রেজেন্ট করব। কেন না সুমিতার জেতা তো ডবল জেতা। ব্যক্তিগতভাবে জেতা, আবার সাধারণভাবে ও যে সব অভিযোগ করেছে সে-সব মিলে যাওয়ায় জেতা।

আমি চুপচাপ বসেছিলুম। সুমিতা বললে 'কী রে নার্ভাস লাগছে ?'

'লাগবে না ?' আমি বলি—'তুই তো সাইকলজির লোক। মনের অতল থেকে তো ভূতও বেরোতে পারে ভগবানও বেরোতে পারে। মনুষ্য চরিত্র প্রহেলিকা আছে...তা-ইই থাকত, না হয়।'

'সাইকলজি বলে মনের অতল থেকে ভূতই বেরোয়। ভগবান ঘোরাফেরা করে আর একটু সারফেসে। তবে ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? অতলের ভূতকে চট করে কেউ আলমারি খুলে দেখায় না। এক যদি পড়ে আমার হাতে সাইকো অ্যানালিসিস করে ভূত বার করব তারপর থেরাপি করে ভূত ভাগিয়ে দেব।'

'রেজাল্ট যাই হোক কেউ কিন্তু মন কষাকষি করতে পারবে না'—সুমিতা চেঁচিয়ে বলল।

'মন কষাকষিটা মন থেকে আসে সুমিতা, ইচ্ছা থেকে নয়। সাইকলজির লোক হয়ে কী করে এমন একটা অর্ডিন্যান্স জারি করছিস জানি না', আমি বলি, 'আগুন নিয়ে খেলতে যাচ্ছিস। সাবধান করে দিচ্ছি।'

কেউ আমার কথা শুনল না। স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে লাগল। শুভম মালবিকাদিকে চেনে না। মালবিকাদিও শুভমকে চেনে না। ছবি দেখে চিনবে। অ্যাডভান্টেজ মালবিকা। মালবিকাদির স্বামী বিকাশকান্তিকেও আমরা কেউই দেখিনি। তিনিও আমাদের না। অ্যাডভান্টেজ সুমিতা। আমার স্বামী নিরুপম শিল্পীকে এক ঝলক দেখে থাকতে পারে। ডিউস। কিন্তু কাজল চন্দনের ক্লাস ফেলো। উভয়েই উভয়কে চেনে। গঙ্গাপ্রসাদবাবুকেও আমি কাজলার বিয়ে হয়ে অবধি চিনে আসছি। মানুষটি লাজুক, চুপচাপ, তাই তেমন আলাপ নেই। তা হলে এই দুটো কেস কী হবে ? সুমিতা বলল অ্যাডভান্টেজ চন্দন আর গঙ্গাপ্রসাদ। আমাদের অর্থাৎ আমাকে আর কাজলকে প্রাণপণে খেলতে হবে।

সুমিতা অবশ্য বলেছিল—'রঞ্জুদি বিকাশকান্তিবাবুকে দেখুক, আমি গঙ্গাজামাইবাবুর ভার নিচ্ছি। গঙ্গাজামাইবাবুকে আমার ব্যাপক লাগে।'

কাজল বলল—'না না। না না। সুমিতা না।'

'কী আশ্চর্য', সুমিতা বলল—'আমরা কি তোমার বরকে সিডিউস করতে যাচ্ছি নাকি ?'

'কী জানি ভাই কী করতে চাচ্ছ। খেলাটা আমি ভাল বুঝতে পারিনি। আমি শুধু জানি আমায় চন্দনের ঘাড় ভেঙে খেতে হবে আর সিনেমা দেখতে হবে।'

'ফাইন্ডিংসও বলতে হবে,' সুমিতা হবে।

'ফাইন্ডিংস আবার কী ?'

'তুমি তাকে কী বুঝেছ, তোমার ভার্শন কী ? সেটা শিল্পীর সঙ্গে মিলছে কি না। আলাদা ডাইমেনশন বেরোয় কি না।'

আমি বললুম, 'তা হলে আগে থেকে রেকর্ড করে রাখো কে নিজের অর্ধাঙ্গর সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করছে। সুমিতা কাগজ-কলম নিয়ে রেডি হ।'

কাজলা আবার বাদ সাধল—'নিজের বরকে কে কী ভাবে সে আবার সব বলা যায় না কি ? আমি এখন যদি ভাবি সে গাধা তো সেটা সবাইকে বলব ?'

শিল্পী বলল—'একটু আগেই তো গোরু বললে। আবার সেইন্টলি বলেছ, এখন বলছ গাধা...'

'উটমুখো, পাগল ছাগল এ সবও আকচার বলে থাকে'—আমি জানাই।

'দাঁড়া দাঁড়া'—সাইকলজির লোক সুমিতা মাঠে নামে—'আমি বলছি, কাজলদি বলতে চায় গঙ্গাজামাইবাবু এত ভাল যে লোকে বোকা বলতে পারে, এত ভুলো যে লোকে পাগল বলতে পারে, এও ডিসিপ্লিনড যে লোকে গোঠের গোরু বলতে পারে। আপন খেয়ালে থাকেন, ছোটখাটো ব্যাপারে মাথা ঘামান

না। ঠিক !'

কাজল বলে—'ওই এক রকম হল।'

'মালবিকাদি। তুমিও কি বিকাশদা সম্পর্কে ওই একই কথা বলতে চাও ?'

'সেইন্টলি ? না ভাই। বড় জোর অনেস্ট। ভোলেভালাও যাকে বলে তা নয়। দাড়ি কামাতে ভোলে না, পালিশ ছাড়া জুতো পরে না, সিগারেট চায়ের কাপে ফেলে না, তবে গোঠের গোরু যদি বলো তো আপত্তি করব না। তবে কাজ পাগলা, আর ভীষণ কাঠখোট্টা, খাদ্য ছাড়া আর কিছুতে রস পায় না। খাদ্য আর থ্রিলার।'

শিল্পী বলল—'চন্দন বরাট আমুদে, দিলখোলা, পরোপকারী ধরনের লোক, এ কথা আমি একা কেন সবাই বলবে। ডেপথ কম আমি নিজেই বলছি ভাই। তবে খুব লাভিং, কেয়ারিং। খাও, হাসো গাও, নির্দোষ স্ফূর্তি করো, দু-এক পেগ খাও, বাস।'

সুমিতা বলল,—'শুভম-এর গ্রেটেস্ট চার্ম হল ও খুব ছেলেমানুষ। খুব চমৎকার বন্ধু হতে পারে। তবে ওই, ম্যাচিওরিটি একটু কম। একেক সময় আমার মনে হয় ছোট্ট ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে প্রেম করছি। তবে সেটা আমার নালিশ নয়। আমি মানিয়ে নিয়েছি। কোনও জটিলতার মধ্যে ও নেই। সরল ধরনের।'

ওরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমি কী বলব ? সত্যি কথা বলবো ?'

'কী রে ?'—কাজলা ঠ্যালা মারল—'আমরা যেন তোদের বাসরে আড়ি পেতেছি মনে হচ্ছে ?'

'যা বলেছিস'—মালবিকাদি বলল—'ন্যাকামিতে গলে গলে পড়ছে।'

'আমাকে তুলে নিলে কিছু হবে না।'—আমি বললুম।

'মানে ?'

'খু-উব নির্লিপ্ত। আমি কোথায় আছি, কেমন আছি, কী খাচ্ছি কী পরছি নিরুপমের কোনও খেয়ালই নেই। আমি যে আছি তাতে ওর কিছু এসে যায় না। না থাকলেও নেই নেই। ওর ওয়ার্ড, ওর কাউন্সিলরগিরি, ওর পার্টি, ওর ইজম, ওর ক্যাডার—এই নিয়ে থাকে। গান-গণসঙ্গীত ছাড়া শোনে না। নাচকে বলে রাবিশ। নাটক, সিনেমা মাড়ায় না। শোনে শুধু ভাষণ, সরোজিনী নাইডু, পদ্মজা নাইডু, রাধাকৃষ্ণন, তারও আগে সুরেন বাঁড়ুজ্জে, বিপিন পাল, ইদানীং-এর মধ্যে হরিপদ ভারতী, অটলবিহারী বাজপেয়ী, সোমনাথ চাটুজ্জে। এঁরা ওর হিরো। ভাষণ যদি ভাল হল তো যাদের ওপর হাড়ে-চটা তাদের সভাতেও গিয়ে দাঁড়াবে।'

'পাগলা'—মালবিকাদি সস্নেহে বলল।

'ভাষণ পাগল'—সুমিতা বলল, 'সেই জন্যেই কি তুই লেখা ধইচছিস ?'

মালবিকাদি বলল 'রঞ্জু লেখা ধইচ্ছে বলে নিরুপম ভাষণ ধইচ্ছে কি না দ্যাখ। ডিম আগে না মুরগি আগে—গাছ আগে না বীজ আগে...'

'দ্যাখো'—আমি ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলি—'আমার লেখা তোমাদের ভাল না লাগে তোমরা পড়ো না, কিন্তু বার বার খোঁটা দিয়ো না, লিখতে লিখতে আমি বড় হয়েছি, লেখাই আমার জীবন...'

'লেখায় তোর জন্মগত অধিকার বলছিস ?' মালবিকাদি টিপ্পনী কাটে।

'লিখতে লিখতেই জন্ম যেন লিখতে লিখতেই মরি'—সুমিতা।

'লোকে যেমন দুধ খেতে খেতে বড় হয় তেমনি তুমি লিখতে লিখতে বড় হয়েছ রঞ্জুদি ?'—শিল্পী।

কাজলকে বললুম—'কী রে তুই এ বার সাঁতলে তোল, এরা তো নানান রকম দিল।'

কাজল বলল 'আমার বলে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল ! আমি এখন অন্যের কড়ায় সম্বরা দিই আর কি !'

এই ভাবেই আমাদের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

শান্তিনিকেতন

এই বার পাঠক, আমি মাঝে মাঝেই আমার আমি সত্তা বিসর্জন দিয়ে রঞ্জনা সত্তাতে অন্যদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেব। বন্ধুদের কাছে একটা প্লট চেয়েছিলুম তো ওরা দিল না। মানে দিল, কিন্তু ওরা জানে না ওরা দিয়েছে। হে ঈশ্বর, ওদের ক্ষমা করো, অকিঞ্চিৎকর মনুষ্যসকল, উহারা জানে না উহারা কী করিয়াছে। কিন্তু ঔপন্যাসিকের বেসিক্স তো আমার আছে। আমি সবজান্তা, সর্বত্রগামী, সর্বত্র উপস্থিত। আমি সমস্ত আমির গহনে ডুব দিতে পারি, আমি মালবিকাতেও আছি, সুমিতাতেও আছি, ধর্মে এবং জিরাফে এক সঙ্গে অবস্থান করার মতো। কর্ণের ছিল সহজাত কবচকুণ্ডল, আমার আছে সহজাত টেলিস্কোপিক লেন্স চোখে, কানে সহজাত হিয়ারিং এইড। বধিরদের জন্যে তৈরি নয় শ্রুতিমানদের স্পেশ্যাল। আমার পায়ে অদৃশ্য রণপা, হাতে গুলতি থেকে বুমেরাং থেকে অতি আধুনিক এ কে ফর্টি সেভেন। পাশুপতাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্রের জন্য সাধনা শুরু করেছি। মনে রয়েছে প্রখর ইন্টুইশন। এমত অবস্থায় আমার অনুকম্পা এত বেশি থাকে যে কখন আমি কাজলরেখা মিত্তির, হাস্যমুখী মৌরি-চিবোনো, পকেটমার হয়ে যাচ্ছি, কখন ধুরন্ধর, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্না বয়ছাঁট মালবিকা সান্যাল হয়ে যাব, কখন হরিণীসদৃশ, ছটফটে, ফন্দিবাজ শিল্পী বরাট, কখন আবার সাইকলজির লোক সুমিতা সরকার হয়ে যাব তার কোনওই ঠিক-ঠিকানা নেই। ভোলেভালা গঙ্গাপ্রসাদ, অতিব্যস্ত বিকাশকান্তি যাঁর নাকি ভুঁড়ো শেয়ালের মতো চেহারা বা পার্ট-টাইম লাইফ-পার্টনার বলে খ্যাত শুভম সরকার বা উদার আমুদে স্বভাবে চন্দন বরাট—এদের যে কেউ হয়ে যাওয়াও আমার কেউ আটকাতে পারবে না। খালি নিরুপমটা আমি পুরোপুরি হতে পারব কি না জানা নেই। প্রদীপের

তলাতেই অন্ধকার বেশি কি না।

আমার দক্ষিণের জানলার থেকে দেখা যায় একটা বিঘে খানেকের প্লট। চারপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পড়ে আছে কোনও ভাগ্যমন্ত পকেট-ভারী এন আর আই-এর জন্যে, কিংবা কোনও ঘোড়েল, ওয়েল কানেকটেড প্রোমোটার-ডেভেলপারের জন্যে।

এই পড়ে থাকাটা আমাদের লাভ। প্রচুর দখিনা বাতাস পাই। একটি পুং তালগাছ তার ঝাড়ালো যৌন-কেশ নিয়ে, একটি বিরাট এবং দু-তিনটে মাঝারি রাধাচূড়া, সাদা গুলঞ্চ একটা, শিমূল দুটো। এখন তাদের রজঃস্বলা অবস্থা শেষ হয়ে গেছে। ফল ফাটিয়ে প্রচুর রেশমি তুলোও তারা পাঠিয়েছে এ বাড়ি ও বাড়ি, এখন নিশ্চিন্ত সবুজ। আরও আছে বাঁকা নারকেল। ঝাঁপালো বেল, কিন্তু বেল পাকলে কাকের কী! আমাদের বাজার থেকেই বেল আনতে হয়, নিমও আছে তার সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযোজ্য। আর আছে সপ্তপর্ণী; যার ওপর আমার বাল্যবয়স থেকে নিদারুণ পক্ষপাত। ঝোপ ঝাড় আছে তলায়, তলায়, কিন্তু এই ছাতিম, গুলঞ্চর ডালপালার ফাঁক দিয়ে, শিমূলের গা ঘেঁষে একটি ছায়াময় পথ দেখা যায়—হলুদ-ব্রাউন, সামান্য একটু পথ, ভাঙা ভাঙা গেটে গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু যেন শেষ হয়নি, চলে গেছে পাঁশকুড়া, মেমারি, শক্তিগড়, বর্ধমান পেরিয়ে গুসকরা, পিচকুড়ির ঢাল, ভেদিয়া পেরিয়ে রিকশা চড়ে সেই মহাবটের গা ঘেঁষে যেথা সেই চৈত্রের শালবন। শালের মঞ্জরীর গন্ধ রোদের গন্ধের সঙ্গে মিশে আপাদমস্তক শা-ন্ত অথচ মত্ত করে দিচ্ছে। গোরুর গাড়ির না-তেল দেওয়া চাকার ক্যাঁচ-কোঁচ ক্যাঁচ-কোঁচ, মাটির বেহালার ছড়ের টানের মতো শুনতে পাই।

অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ মিত্র এখন শান্তিনিকেতনে। প্রায়ই যান। কখনও অতিথি অধ্যাপক হয়ে, কখনও গবেষণার কাজে, নিজের তো বটেই, প্রোফেসর জেনকিন্‌স বলে এক অস্ট্রেলীয় ছাত্রের জন্যও তাঁকে যেতে হয়। একটি লিটল ম্যাগের শারদীয় সংখ্যার জন্য জেনকিন্‌স একটি প্রবন্ধ লিখছেন। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের সব কবিই রবীন্দ্রনাথের মতো লেখা দিয়ে শুরু করেছেন—এই তাঁর প্রতিপাদ্য, জীবনানন্দর 'ঝরা পালক', সুধীন্দ্রনাথের 'তন্বী', বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা' প্রধানত তাঁর শিকার। প্রবন্ধের নামটা প্রোফেসর জেনকিনস আগেই ঠিক করে ফেলেছেন, প্রোফেসর গঙ্গাপ্রসাদ বন্ধু (মিত্র)কে না জিজ্ঞেস করেই। নাম—'উত্তররৈবিকে রবিরুদয়।'

গঙ্গাপ্রসাদ বলেন 'নামটা একটু খটোমটো হয়ে গেল না?'

'খাটোমাটো বলেই তো আগ্রহ যেমন "চলচ্চিত্ত চঞ্চরী', যেমন "সন্মার্গ সপর্যা"।' প্রোফেসর বলতে চান খটোমটো বলেই নামটা লোকের আগ্রহ ঔৎসুক্য জাগাবে।

'কিন্তু রবিরুদয়টা যেন কেমন,' গঙ্গাপ্রসাদ খুঁত খুঁত করতে থাকেন। 'রবেঃ+উদয় = রবেরুদয় একটা হয় আর একটা হতে পারে

রবি+উদয় = রব্যুদয়। কিন্তু...'

অধ্যাপক জেনকিন্‌স তাড়াতাড়ি তাঁকে থামান, —'আপনার গোড়া গলদ হচ্ছে অধ্যাপক বন্ধু—এটি বাঙালা সন্ধি। রবির+উদয় = রবিরুদয়। অক্সিমোরোন অর্থে বিরোধাভাস অলোঙ্কার হল। গোড়াতেই পাটকের চমক হচ্ছে।'

ফাদার জেনকিন্‌স আজকাল বাংলা উচ্চারণ অনেক সড়গড় করে নিয়েছেন। তার ওপরে সংস্কৃতও শিখছেন। কিন্তু অত কঠিন 'চলচিত্তচঞ্চরী' বা 'সন্মার্গ সপর্যা' উচ্চারণ করতে তাঁর অসুবিধে হচ্ছে না অথচ সামান্য পাঠককে কেন তিনি সব সময়েই মেরে পাট করে দেওয়ার মতো 'পাটক' বানিয়ে দেন, প্রায়ই হচ্ছেকে 'হোছে' বলেন তা গঙ্গাপ্রসাদ বুঝতে পারেন না। বাংলাকেই বা তিনি কেন 'বাঙালা' বলবেন? বেশি কথা কি তাঁর আলোচিতব্য তিনটি বই? 'ঝরা পালক' কী তিনি বলেন? বলেন 'জরা পালক', 'তন্বী'ও তিনি বলেন না, বলবেন 'তনভি', বেশি চাপাচাপি করলে 'তিন্নি তিন্নি' বলে হাততালি দেবেন। এমন নয় যে তিনি অধ্যাপক বন্ধুকে খ্যাপাতে চাইছেন, এ বয়সে কি আর খুনসুটি মানায়? আসল কথা সঠিক উচ্চারণটা তিনি ঠিকমতো ধরতে পেরেছেন মনে করেই আনন্দে হাততালি দ্যান। ভারী সরলমতি ছেলেমানুষ ফাদারটি। তারপরেই ব্যন্ডির বাডনা বলে তিনি ব্যাণ্ড বাদ্য বাজিয়ে দেবেন।

খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হন গঙ্গাপ্রসাদ। দোষটা তাঁরই। তিনিই যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফাদারকে শেখাননি। ফনেটিকস চর্চা তিনি তেমন করে করবার সময় পাননি। আজীবন তিনি জীবনান্দে মজে আছেন। ফলে তাঁর খানিকটা ইয়েটস চর্চা, পো-চর্চা আছে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়-চর্চাও তিনি করে থাকেন। কিন্তু ফাদার জেনকিনস তাঁর ছাত্র হওয়ার আগে ফনেটিকস-চর্চার উপযোগিতা তিনি বুঝতে পারেননি।

যাই হোক, 'উত্তর-রৈবিকে রবিরুদয়'—শিরোনামটা শুনেই দুর্গাপুরের একটি লিটল ম্যাগাজিন ফাদার জেনকিন্‌সকে স্বাগত জানিয়েছে। যদি প্রবন্ধটা খুব বড় হয়ে যায় তো তার জন্যে কয়েক ফর্মা বাড়াতেও ওরা রাজি আছে, অবশ্য সবিনয়ে জানিয়েছে ফাদার জেনকিন্‌স্ যদি সামান্য ব্যয়ভার বহন করেন, তা হলে ...পূর্বাঞ্চলের সমস্ত সংস্কৃতিমান পাঠকই 'উস্রী' শারদীয়র জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকেন তো! ফাদার লেখা শুরু করার আগেই পঞ্চাশ ডলার পাঠিয়ে দিয়েছেন। তো এখন ফাদারকে সহায়তা করা কি গঙ্গাপ্রসাদের পবিত্র কর্তব্য নয়?

শিরোনাম নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদের খুঁতখুঁতুনি যে কিছুতেই যাচ্ছে না এ ব্যাপারে ফাদারের জ্ঞান টনটনে। তিনি ভাল করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন—'বাঙালা সাহিত্যে আমি কিছু অবদান করতে চাই। অধ্যাপক বন্ধু। নুতুন কিছু। পুরনোর চর্বণচর্বিতে কী লাভ হচ্ছে? বাঙালা ইউসেজের একটি বই অধ্যাপক

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বার করেছেন, তাতে তিনি ওনেক স্বাধীনতা দিচ্ছেন, যেমন ফাউলারের নুতুন এডিশন। কিন্তু আমি আরও স্বাধীনতা করতে চাই।'

গঙ্গাপ্রসাদ সংক্ষেপে শুধু বলেন, 'নীরেন্দ্রনাথ কবি, তিনি অধ্যাপক নন।'

'কিন্তু তিনি তো ভাষণ দিচ্ছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সব ভিড় কচ্ছে। যেমন আর্নল্ড'

'কিন্তু আপনাদের আর্নল্ড পোয়েট্রির চেয়ারে ছিলেন অক্সফোর্ডে। অডেন, স্পেন্ডার এঁদের কথা ধরুন, সবাই তো ভাষণ দিয়েছেন বাবা জেনকিন্‌স। কিন্তু তাঁদের পরিচয় কি অধ্যাপকের।'

বাবা জেনকিন্‌স্ শুনে ফাদার ঘাবড়ে যান। গঙ্গাপ্রসাদ খুবই সদাশয় মানুষ, কিন্তু কোনও কারণে বিরক্ত হলেই তিনি বাবা জেনকিন্‌সটা বলে থাকেন। এখন, গঙ্গাপ্রসাদের বিরক্তির কারণ ওই 'বিশ্ববিদ্যালয়' এবং 'ভির', বিশ্ববিদ্যালয়টা পরিষ্কার উচ্চারণ করে 'ভিড়ে' এসে ফাদার জেনকিন্‌স ভিরমি খান কী করে?

যাই হোক, এই কাজে এখন মগ্ন, গঙ্গাপ্রসাদ এবং তাঁর ছাত্র। খুবই মগ্ন, ছাত্র মগ্ন পড়াতে এবং লেখাতে। মাস্টার মগ্ন এড়াতে এবং পালাতে। এ ছাড়াও গাছের তলায় ছাত্রদের স্পেশ্যাল ক্লাস নিতে গঙ্গাপ্রসাদের অনেকটা সময় যায় এ মত সময়ে পত্নী কাজলরেখা মিত্তিরের একটি চিঠি আসে—

'প্রিয়তমেষু,

আশা করি তুমি তোমার বাবা-সহ ভাল আছো। তোমাকে দুটি মা-ও পাঠাচ্ছি কত দিন আর মাতৃহীন হয়ে কাটাবে বেচারি খোকাবাবু? একটি মা তোমার সাক্ষাৎ কন্যা সে তোমাদের ওপর নজর রাখবে। আর দ্বিতীয়টি আমার সাক্ষাৎ বন্ধু বা বান্ধবী বা বন্ধুনী রঞ্জনা 'পরদারেষু লোষ্ট্রবৎ।' সে কয়েকদিন শান্তিনিকেতনে যাপন করতে চায়, বিশেষ শান্তির আশায়। দেখো কারও কোনও অশান্তির কারণ না হয়।

ইতি

একান্ত তোমারই

কাজল

চিঠিটি পেয়ে গঙ্গাপ্রসাদ হতবাক হয়ে যান। 'প্রিয়তমেষু?' এই সম্বোধন কাজলরেখা মিত্তির তাঁকে এ জন্মে কখনও করেনি। প্রথম বিবাহের পর তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনারে যোগ দিতে যান এবং পত্নীকে প্রিয়তমাসু সম্বোধনে চিঠি দ্যান। সে লজ্জার কথা গঙ্গাপ্রসাদ ইহজীবনে ভুলবেন না। চিঠির উত্তরে যে চিঠি আসে সেটি কম্পিত হাতে খুলে তিনি দেখেন সম্বোধন লেখা রয়েছে—গঙ্গাপ্রসাদেষু জাঠামশাইসু। ভেতরে যা লেখা আছে তা আর কহতব্য নয়। বাংলার মাস্টারমশাইকে তাঁর নব পরিণীতা পত্নী জ্ঞান দিয়েছে—বিংশ শতকের গোড়ার দিকেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গিন্নিবান্নি স্ত্রীকে 'ভাই ছুটি' বলে সম্বোধন করেছেন। গঙ্গাপ্রসাদ তাঁর বিরহ কাতরতার কথা

জানিয়েছিলেন, কাজল লিখেছিল বিরহ খুব স্বাস্থ্যকর। তিনি আদর সোহাগ সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে চুম্বন দিয়েছিলেন। কাজল তার উত্তরে লেখে—বাবা গো এত দূর থেকেও আমার হাঁসফাঁস লাগছে, ঝাঁটা গোফ ফুটছে।

সেই বেরসিকা স্ত্রী আজ তাকে একুশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে 'প্রিয়তমেষু' সম্বোধন করছে? কন্যা অর্থাৎ তীর্ণা। তিনু আসছে, খুব ভাল কথা। তিনু এলে তাঁর খাওয়া দাওয়ার সুবিধে হয়। তিনু নিজে পাঁচরকম খেতে ভালবাসে কাজেই ফরমায়েশ করে ভালমন্দ তৈরি করায়। তিনু তাঁদের অর্থাৎ তাঁকে ও ফাদার জেনকিন্‌সকে দেখাশোনা করবে, এ খুব ভাল প্রস্তাব, বাবা জেনকিন্‌স তাঁকে পাগল করে দিতে শুধু বাকি রাখছেন, সে ক্ষেত্রে তিনু একটা রিলিফ। কিন্তু 'নজর রাখা' ইউসেজটা কি কাজলের ঠিক হল? ভাষার এ রকম ব্যবহার ফাদার জেনকিন্‌সকে মানায়, কিন্তু কাজল? তারপর রঞ্জনা কাজলের বয়সী একটি ধাড়ি মেয়ে সে তাঁর মা হতে যাবে কেন? তাঁর মা হতে হলে রঞ্জনাকে আরও ধাড়ি হতে হবে, নয়তো আরও অনেক কচি, এগুলো কি কাজলের বাড়াবাড়ি নয়? 'পরদারেষু লোষ্ট্রবৎ' এই বচনই বা সে অসঙ্গতভাবে উদ্ধৃত করল কেন? কাজলের কি মাথা খারাপ হয়েছে? তার ওপরে 'একান্ত তোমারই?'... গঙ্গাপ্রসাদ ভেবে-চিন্তে কিছুই স্থির করতে পারেন না। কাজলের মাথা যে চট করে খারাপ হবার নয় এ তিনি হাড়ে হাড়ে জানেন। তবে?

এ দিকে তীর্ণা আর রঞ্জনা এসে পৌঁছয়। এই গরমে কেউই আর স্টেশনে যাননি। গাছ-গাছালির ছায়ায় ছায়ায় থাকতে পছন্দ করেছেন। তা ছাড়া ফাদার জেনকিনসের ঘরটি এয়ার কন্ডিশনড। এয়ার-কন্ডিশনারটি ফাদার টোপ হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। হয়তো গঙ্গাপ্রসাদ নিজের ঘরে নিজের কাজে মগ্ন। ফাদার জেনকিন্‌সও 'জরা পালক' নিয়ে পড়েছেন। কিছুটা লেখার পরই তাঁর মনে হয় এটুকু অধ্যাপক বন্ধুকে দেখিয়ে নেওয়া ভাল। সহজে যে গঙ্গাপ্রসাদ ঘাড় পাতবেন না, তা এত দিনে ফাদার জেনে গেছেন। তিনি এয়ার কন্ডিশনারটি 'ফুল' চালিয়ে দিয়ে গঙ্গাপ্রসাদের ঘরে উঁকি মারেন—'ওহ। অধ্যাপক আপনি যে কী করে এই গর্মে মনঃসন্নিবেশ করছেন?'

মুখ না তুলেই গঙ্গাপ্রসাদ বলেন—'আমরা গরম দেশের মানুষ গরমে আমাদের মনোযোগ নষ্ট হওয়া উচিত নয়।'

'সন্ন্যাস করবার কী জরুরি অধ্যাপক বন্ধু, আমার ঘরে এখন আমলকির ওই ঢালে ঢালে, টেবিলে যথেষ্ট জাগা। আসুন না।' অর্থাৎ ফাদার বলতে চাইছেন সন্ন্যাস অর্থাৎ কষ্ট করার কী দরকার? তাঁর ঘরে এখন শীতের আবহাওয়া। তিনি শান্তিনিকেতনে রয়েছেন সুতরাং "শীতের পাতায় লাগল নাচন আমলকির ওই ডালে ডালে" উদ্ধৃত করবার লোভ তিনি সামলাতে পারেননি। প্রথম অংশটা মনে না থাকাতেও তিনি মোটেই ঘাবড়াননি।

এখন এই আহ্বানে যদি এক বার গঙ্গাপ্রসাদ লুব্ধ হয়ে ফাদারের ঘরে যান

তো হয়ে গেল। ওই চমৎকার ঠাণ্ডা থেকে তিনি আর বেরিয়ে আসতে পারবেন না। এবং এক ফাঁকে ফাদার তাঁর কাজটি সেরে নেবেন।

এই পরিস্থিতিতেই রঞ্জুমাসিকে নিয়ে তীর্ণা পৌঁছয়।

'আমাদের জন্যে কী রান্না করিয়েছ?' এসেই তীর্ণা মিলিটারি স্টাইলে জিজ্ঞেস করে। 'তার আমি কী জানি?' গঙ্গাপ্রসাদ ঠাণ্ডা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলেন।

'মানে?'

'রান্না-বান্নার ব্যাপার-স্যাপারের আমি কী জানি বল! শম্ভুকে বলে দিয়েছি তোরা আসছিস বাস।'

ফাদার জেনকিন্‌স এই সময়ে হাস্যমুখে বলেন—'জোল-ভাত। আমরা গর্মে জোল খাই। রোহির জোল।'

'আমি তো একা নই রঞ্জু মাসিও আসছে আর তুমি ঝোল ভাতের অর্ডার দিলে?' তীর্ণা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

রঞ্জু মাসি তাড়াতাড়ি বলে 'ওমা, ঝোল ভাত তো ভাল জিনিস। এই গরমে আর কিছু খাওয়া যায়? সত্যজিতের, "অশনি সংকেত"-এর শেষ দিকে "মাছের ঝোল ভাত" বলতে বলতে একটা মেয়ে মরে গিয়েছিল, মনে নেই? তার শেষ ইচ্ছে "মাছের ঝোল ভাত।"

'তাই বলে আমাদেরও কি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঝোল ভাত খেয়ে যেতে হবে রঞ্জু মাসি? মা গরমের দিনে রোজ বলবে আজকে পাতলা করে একটা ঝোল রেঁধে ফেলি কী বলিস? শীতের দিনে বলবে—আনাজ পাতি শস্তা, কত রকম। জম্পেশ করে একটা ঝোল রাঁধছি। উই আর ফেডআপ উইথ ঝোল।'

গঙ্গাপ্রসাদ এই সময়ে বলেন 'তা কেন? এখন তোর রঞ্জুমাসি এসেছেন উনি ঠিকই একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন।'

রঞ্জুমাসির মুখ যে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে তা তিনি লক্ষ করেন না। ও দিক থেকে ফাদার হাততালি দিয়ে ওঠেন, 'জগাখিচুড়ি, কাফতা, কোবাব, পালাও, কাঁটালের ডালডা, মোচের চপ...'

রঞ্জনার মুখ এ বার লালচে হতে শুরু করেছে সবাই লক্ষ করে। গঙ্গাপ্রসাদ কাঁচুমাচু মুখে ক্ষমা চান—'বুঝলেন রঞ্জুমাসি, অতিরিক্ত উৎসাহ হলে ফাদারের বাংলা একটু গুলিয়ে যায়। উনি আপনার রান্নার প্রতি কোনও কটাক্ষ করেননি। উনি কাউকে পালাতে বলছেন না। গোঁফের চপও ফরমায়েশ করছেন না। আর খিচুড়ি আর জগা-খিচুড়ির তফাত আমি ওঁকে আজও বোঝাতে পারিনি।'

ফাদারও জোড় হাত করেন। কিন্তু তাঁরা কেউই রঞ্জুমাসির লালচে হওয়ার আসল কারণটা ধরতে পারেননি। মোচের চপ যে মোচার চপ এটা রঞ্জুমাসি ঠিকই বুঝেছিলেন। কিন্তু এই বিদেশি ফাদারটি তাকে দিয়ে এই সব রাঁধাবে

নাকি? তার ওপর আদিখ্যেতা করে গঙ্গাপ্রসাদ যদি পোঁ ধরেন। বাড়িতে শেফালিই আছে, এখানে কে তাকে উদ্ধার করবে? তীর্ণার রকম-সকমও তো ভাল ঠেকছে না।

শম্ভু এতক্ষণ রঞ্জুমাসি ও তীর্ণার ব্যাগ সুটকেস ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এ বার বলল—'না, না, বিউলির ডাল আর বড়ি পোস্ত হয়েছে। কাঁচা আম দিয়ে মৌরলা চচ্চড়ি আর লালশাক ভাজা। দই পেতেছি রাত্তিরে বেশি করে।'

ফাদার বললেন, 'কাদ্যতালিকা ভাল। আর দুই বাদ তো খেতেই যাচ্ছে না।' 'দুই' মানে দুটি পদ তিনি বোঝাননি। তিনি বুঝিয়েছেন 'দই।'

সুমিতা

রঞ্জনা শান্তিনিকেতন যাবার দিন দুই পরে কাজল সুমিতার ফোন পায়।

'রঞ্জুদিকে কোথায় হাপিস করেছিস রে কাজলদি?'

'রঞ্জু ট্রেকিং-এ গেছে শান্তিনিকেতনে।'

'রঞ্জু ট্রেকিং-এ? শান্তি...ইয়ার্কি মারছিস!'

'ইয়ার্কি কী আছে। তোর সঙ্গে যে সে দিন বাজি হল, তা সেই ফরাসি পার্ফুমের জন্যে আমরা সব দুঃসাহসিক অভিযানে নেমে পড়েছি, না?'

'তাই বল, গঙ্গাপ্রসাদদাও শান্তিনিকেতনে।'

'এবং আমিও শান্তিনিকেতনে।'

'মানে?'

'মানে আর কি, আমিও অগাধ শান্তি উপভোগ করছি। আমার বাড়িটি শান্তির আধার। তুই ইচ্ছে করলেই আসতে পারিস।'

'ডুবে ডুবে জল খাস কাজলাদি। দিব্যি বরকে সরিয়ে দিয়েছিস যাতে বরাটের আসার পথে কোনও কাঁটা না থাকে। বা বা।'

কাজল বলল 'যা ব্বা বা। নিজেই বললি বরেদের সব আবিষ্কার করতে হবে নিজেই এখন পথের কাঁটা-টাঁটা বলছিস। তা ছাড়া কাজল কখনও ডুবে ডুবে জল খায় না, ভেসে ভেসেই খায়। তোরা কি কোনও নির্দিষ্ট প্রসিডিওর ঠিক করেছিলিস? বলেছিলিস কি যে এই কলকাতাকেই আমাদের গবেষণাগার করতে হবে?'

'না তা অবশ্য করিনি, সরি।'

'তা সে যাই হোক রঞ্জুকে এত খুঁজছিস কেন?'

'একটা দারুণ ডিসকভারি করেছি।'

'ডিসকভারি? তো সেটা আমাকে বলা যায় না? না হয় একটা সী-গ্রিন ঢাকাই-ই কিনেছি। যে ঢাকাই কেনে সে কি আঁতেল হয় না? মাসে চার পাঁচটা শাড়ি কিনলেই সে ডিসকোয়ালিফাই করে গেল?'

'উফ কাজলাদি চুপ করবি ? তো শোন বিকাশকান্তিবাবুর মোটেই ভুঁড়ো শেয়ালের মতো চেহারা না। অন্তত ছ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা, পেটা চেহারা একেবারে ; মুখের মাস্‌ল একটাও আলগা হয়নি।'

'রং ?' কাজল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'কালো ? তা সে যতই কালো হোক দেখেছি তার...' সুমিতা গান গেয়ে ওঠে।

'চুল ?'

'ওইখানেই তো আসল মজা রে কাজলা। মালবিকাদিটা একটা ডাহা ধাপ্পাবাজ।'

'সে আমি আগেই জানি।'

'তুই তো সব জানিস। তা শোন না। চুলগুলো সব একেবারে সাদা।'

'কাঁটালের ভুতি টুতি কী সব বলছিল না মালবিকাদি, আসলে চকচকে সাদা একটু কোঁকড়া চুলগুলো কী রকম অদ্ভুত ফুলে থাকে। দুর্ধর্ষ !'

'কোন বিউটি-সেলুনে যান ? ড্রয়ার-ব্লোন বোধ হয়।'

'এটা তো আমার অকার করেনি রে ! তা সে যাই হোক, ওতে কিছু আসে যায় না। ব্যাপক লেগেছে আমার।'

'কালো ? তা সেই যতই কালো হোক, দেখেছি তার সাদা চুলের ক্লোক।' কাজল মাউথ-পিসের মধ্যে গেয়ে দিল।

'ভাল বলেছিস। বীভৎস একেবারে।'

'তা সে যেন হল, কিন্তু মালবিকাদির বর সুন্দর বলে তোর অত আনন্দ কেন ?'

'মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে থেকে থেকে তুইও যে ব্যাকডেটেড হয়ে গেলি রে কাজলা। সুন্দর-টুন্দর অ্যাডজেকটিভ এখানে লাগে না, একে বলে বীভৎস।'

'ঠিক আছে, মালবিকাদির বর বীভৎস বলে তোর পুলক কেন ?'

'আরে বুঝলি না, প্রোব করবার মতো অবজেক্ট চাই না ? তেইশ ইঞ্চি বুকের খাঁচা। রগের কাছ থেকে মাথা ফাঁকা হতে শুরু করেছে। দিনে চব্বিশ বার অ্যান্টাসিড চিবোচ্ছে, এ রকম কেউ হলে চেষ্টা করবার চেষ্টা আসে ? একটা খোঁচা দিলেই তো প্রোব শেষ ! আ'অ্যাম একসাইটেড, ইন্সপায়ার্ড।'

'কী করে দেখলি ? মালবিকাদির বাড়ি গিসলি ?'

'পা-গল ! চলে গেলাম সোজা সল্ট লেক। সেক্টর থ্রি, অফিসে ঢুকে পড়লাম। নিজের কার্ড পাঠিয়ে দিলাম।'

'তোর আবার কার্ড আছে না কি ?'

'তবে ? ল্যামিনেটেড কার্ড।'

'বাস ! ডেকে পাঠালেন ?'

'লেকচারার দ্য সাইকলজি আবার সাইকো-অ্যানালিস্ট, ডাকবে না মানে ?'

'কী পরেছিলি ?'

'ছাপা শাড়ি।'

'এঃ। আমার থেকে একটা ধার নিতে পারতিস !'

'এ ছাপা সে ছাপা নয় দেবী, এ হল বুটিক ছাপ, ডিজাইনার, লাখে একটি। অফ-হোয়াইট বেসের ওপর লাল কালো হলুদ কটকটে সবুজ দিয়ে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা, জগন্নাথ সুভদ্রা বলরাম, সুভদ্রা জগন্নাথ বলরাম...'

'উরি স্ সাবাশ্, তো সার তোর শাড়ি লক্ষ করলেন ? এনি কমেন্ট ?'

'আজ্ঞে না ম্যাডাম, সার তো আর তাঁতি নয়। ছেলেরা শাড়ি-ফাড়ি বোঝে না। দ্যাখে টোট্যাল এফেক্ট।'

'টোট্যাল এফেক্ট সম্পর্কে তোকে উপদেশ দিতে যাওয়া মানে মায়ের কাছে মাসির গল্প। তবু জিজ্ঞেস করি তুই কি তোর গোছা গোছা পুঁতির গয়না পরে গিয়েছিলি ?'

'আজ্ঞে না, সুমিতা সরকার অত বোকা নয়। রুদ্রাক্ষের অল্পঝোলা দুল, গলায় সরু তুলসী বীজের মালা, হাতে ব্রাউন রুলি।'

'তোর কী করে ধারণা হল ভৈরবী-বোষ্টুমির কমবিনেশনটা ধরবে ?'

'দ্যাখ কাজলদি, ধরবে নয়, খাবে। কোনটা খায় কোনটা খায় না, সে সম্বন্ধে আমার কিছু টেকনিক্যাল কিছু ইনটুইটিভ জ্ঞানগম্যি আছে। কিন্তু এখন আমি সে সব ভাঙব না। তোর অ্যাপ্রোচ তোর, আমার অ্যাপ্রোচ আমার'

'তাই ? তো তারপর ?'

'তার তো অনেক পর আছে। আমার চড়চড় করে বিল উঠছে, আমি রাখি তুই বরং তারপর ডায়াল কর।'

কাজল বলল— 'ইল্লি আর কি ! তারপর তুই এক ঘণ্টা ধরে বকবক কর আর আমার বরের বিল উঠুক। তোর শুভম আমার গঙ্গার তিন ডবল মাইনে পায়, খাই-খরচ নেই। তুই নিজে চার হাতে রোজগার করছিস, ইয়ার্কি পেয়েছিস ! বরং আবার কাল ফোন করে ডেভেলপমেন্ট জানাস।'

শুভম

শুভম সরকারের প্রথম হবি যদি হয় ঘুম, তো দ্বিতীয় হবি আড্ডা। প্রচণ্ড আড্ডাবাজ ছিল সে এককালে। সেইখান থেকে তুলে এনে যখন তাকে জাহাজে জুতে দেওয়া হয়, তখন সে জাহাজটাকেই যথাসম্ভব আড্ডাখানা করে ফেলবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সাধ মেটাতে অতএব বাড়ি ফিরেই তাকে আড্ডার খোঁজে বেরোতে হয়। এবারও অন্যান্যবারের মতোই শুভম ঘুম থেকে উঠল পাঁচটা বাজিয়ে। বিকেল পাঁচটা। সারাদিনের রাগী চেহারা এখনও সম্পূর্ণ যায়নি। তবু ভুরভুরে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে। আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে, সাইড-টেবিলে রাখা ফ্লাস্ক থেকে শুভম চা খেল। আরও দু বার হাত পা ছাড়াল। পাশের ঘরে তার দুই মেয়ে দেবাঞ্জলি আর আম্রপালী নাচ

প্র্যাক্টিস করছে। তা তা থেই তেই এই সব অর্থহীন বুকনি উচ্চকণ্ঠে তাদের নাচের মাস্টারমশাইয়ের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। সুমিতা একটু দেরিতে বেরিয়েছে আজ, ফিরবেও দেরিতে। চান করে পায়জামা পাঞ্জাবি ও ঘাড়ে-পাউডারে সুসজ্জিত হয়ে শুভম মেয়েদের ঘরে উঁকি দিল, দেবাঞ্জলি তখন হাতের এমন একটা মুদ্রা করছিল যাতে মনে হল সে বাবাকে একটু সুললিতভাবে টা টা করছে। শুভম বাড়ানো গলা গুটিয়ে নিল। মা ঘরে ঘরে ধূপ দিচ্ছে। বলল 'বেরোচ্ছিস ?' মানে শুভম যে বেরোবেই, তার বেরোনোই যে ভাল এটা সবাই জানিয়ে দিচ্ছে। বাবার ব্যবহার আরও ভাল। তিনি সত্তর বছর বয়সে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে, আরাম চেয়ারে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছেন। মধুবালা দিলীপকুমার। 'প্যার কিয়া তো ডরনা ক্যা ?'

শুভম বেরিয়ে পড়ে। রোজই এ সময়টা সে কফি-হাউজে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা যে হবেই, এমন কথা নেই। তবে হলেও হতে পারে। রাধেশ্যাম কি আসবে ? তবে শুভম-এর আসল যেটা লোভ সেটা হচ্ছে কফি-হাউজের আবহাওয়া। এক কাপ কফি নিয়ে সে এক কোণে বসে থাকে। তার মনে থাকে না বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বয়স হয়ে গেল, সে এখন মাস গেলে পঁচিশ হাজার টাকার মতো মাইনে পায়, তা ছাড়াও বহু পার্কস। মনে থাকে না বন্ধুরা সব চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, অনড় আছে শুধু শয়তান রাধেশ্যামটা। সে যেন সেই আধা-বেকার সদ্য যুবক যে তর্ক করতে ভালবাসত, নাটক দেখা যার জীবনের অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ত, সব রকমের গানের আসরে যাকে দেখা যেত। আজও সে দোতলায় উঠে ডান দিকের কোণের দিকে এগোচ্ছিল, দেখল এক মহিলা তার জায়গাটা নিয়ে বসে আছেন। ভারী বিরক্ত হল সে। খুবই অযৌক্তিক এ বিরক্তি। জায়গাটা তো তার কেনা নয়। তবু সতৃষ্ণ নয়নে জায়গাটার দিকে আরেকবার তাকাল সে। ভদ্রমহিলা তার দিকে চেয়ে খুব সপ্রতিভভাবে বললেন—'বসবেন ?'

'না' বলাটা ভাল দেখায় কি ? শুভম ধন্যবাদ জানিয়ে বসল। ভদ্রমহিলা কফির কাপে চুমুক দিলেন। কাঁচা পাকা বয়ছাঁট চুল মহিলার। চোখ দুটো ছোট কিন্তু ঝকঝকে, লম্বাটে মুখ, নাকটা চোখা। বেশ ধারালো অথচ নারকুলে কুলের মতো মসৃণ। টেবিলের ওপর একটা মোটা ফাইল, কাঁধেও ব্যাগ।

'আমি মালবিকা সান্যাল। আপনি ?'

'শুভম সরকার। আপনি কি ইউনিভার্সিটিতে আছেন ?'

একটু হাসলেন ভদ্রমহিলা—'মাস্টারি না করেও তা হলে মাস্টারির ছাপ পড়ে গেছে চেহারায় ?'

'না, না, তা নয়' শুভম খুব অপ্রস্তুত হয়। বছরের আটটা মাস তাকে অকূল বারিধিতে কোমল নারীসঙ্গবিবর্জিত কাটাতে হয়। নারীদের সম্পর্কে সে খুব স্পর্শকাতর। মানে, নারীদের স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে সে খুব স্পর্শকাতর। খুবই। বাড়িতে এই স্পর্শকাতরতা সে বিশেষ প্রয়োগ করতে পারে না। তার

বাড়ির নারীরা তার আট মাস বাইরে থাকাটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে মনে হয়। তা ছাড়া তারা যেন কেমন ! মা নির্লিপ্ত, স্ত্রী নিজের কাজকর্ম নিয়ে সবসময়ে উৎসাহে টগবগ করছে। দীর্ঘ বিরহের জন্য একটু রোম্যান্টিক বিষাদ, একটু আলাদা আকুলতা যদি তার থাকত ! ছিল, মেয়েরা হবার আগে ছিল। কিন্তু মেয়েরা যত বড় হচ্ছে সুমিতা তত প্র্যাক্টিক্যাল হয়ে যাচ্ছে।

শুভম একটু সাহসী হয়ে বলল— 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি জাক দেরিদার ফলোয়ার। ক্ষুরধার বুদ্ধি না হলে তো ঠিক...

বিদেশি স্টাইলে গ্যালাস্ট্রি না করেও যে ভদ্রমহিলাকে সূক্ষ্মভাবে কমপ্লিমেন্ট দেওয়া গেল কোনও রক্ষণশীল ভদ্রতাবিধি লঙ্ঘন না করে এবং সাহিত্যিক বিশ্বে লেটেস্ট দেরিদার নামটা যে সে শুনিয়ে দিতে পেরেছে এই আঁতেল মহিলাটিকে তাতে শুভমের একটা দারুণ আত্মতোষ হয়।

মহিলা হেসে বললেন 'দেরিদা কি তাড়াতাড়িদা কারওই ফলোয়ার আমি নই। একটু আধটু সোশ্যাল ওয়ার্ক করে থাকি। কখনও কাজ হয়, কখনও হয় না। আপনার কফি এসে গেছে, পান করুন।'

শুভম হাসি-হাসি মুখে কফিতে এক চুমুক দিল, বলল— 'আজ কাজ হল ?'

'কাজ হবে বলেই আশা করছি অপেক্ষা করছি, আশা করতে তো পয়সা লাগে না, তা ছাড়া আমার বন্ধুরাও আমাকে সাহস দেয়, প্রেরণা দেয়।'

'আপনার বন্ধুরাও সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন ?'

'আনসোশ্যাল বা অ্যান্টিসোশ্যাল কিছু করে না—এটুকু বলতে পারি।' শুভম হেসে ফেলল। মহিলা ভারী মজার তো ? চোখেমুখে সব সময়ে একটা মজা-পাওয়া হাসি খেলা করছে। তবে চালাকও কম নয়। কায়দা করে তার প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

'কফিটা এখানে ঠিক আগের মতোই আছে বলুন ?'

'তা আছে। সবই চেঞ্জ করছে, কিন্তু কিছু কিছু যদি অপরিবর্তিত অবিচলিত থেকে না যায়, তা হলে তো পৃথিবীর রিদম্‌টাই নষ্ট হয়ে যাবে !'

'যেমন ?' —শুভম তর্কের গন্ধ পেয়ে খাড়া হয়ে ওঠে।

'যেমন ধরুন জল, মানে জলধি। ডাঙায় তো সবই চেঞ্জ করে যাচ্ছে কিন্তু সমুদ্রে ? সেই একই নীল, একই সবুজ, একই ঢেউ, গভীরতা, চোরা স্রোত, সেই একই তিমি হাঙর, উড়ুক্কু মাছ। আপনি যখন ডাঙা থেকে জলে যান তখন জীবনের সেই অপরিবর্তনীয় ছন্দ কি আপনি অনুভব করেন না ?'

'আমি ডাঙা থেকে জলে যাই—আপনি কী করে বুঝলেন ? কী করে বুঝলেন আমি জাহাজের লোক ?'

'আপনি জাহাজের লোক বুঝি ? আমি সাধারণভাবে ডাঙা থেকে জলে যাওয়ার কথা বলছিলাম। নানা কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের তো এখন জলে নামতেই হয় ! তো কিছু মনে করবেন না, আপনি কি খালাসি না সারেং ?'

শুভম এত জোর হেসে উঠল যে আশেপাশে অনেকেই ফিরে তাকাল।

তবে সেটা বেশিক্ষণের জন্য নয়, তারা নিজেরাও এত হাসছে, চেঁচাচ্ছে যে তাদের দিকেই কে ফিরে তাকায় তার ঠিক নেই।

'খালাসি বা সারেং ছাড়া জাহাজে আর কেউ কাজ করে না বুঝি ?' শুভম এখনও হাসছে।

'কিছু মনে করবেন না আমার গল্পের বই পড়া বিদ্যে তো ! খালি সারেং আর খালাসিদের উল্লেখই পাই সব জায়গায়। আর অবশ্য ক্যাপ্টেন থাকেন। তো জাহাজের ক্যাপ্টেনদের তো ভীষণ রাফ হাবভাব, রেলাও খুব, তাই...'

ভদ্রমহিলার ছেলেমানুষিতে শুভম-এর ভারী একটা স্নেহ একটা বাৎসল্য জন্মায়। তার ওপর 'রেলা'...

'তা আমাকে কি খালাসি মনে হয়। ক্যাপ্টেন না হয় না-ই মনে হল।'

ভদ্রমহিলা জিভ কাটলেন— 'ছি, ছি, আপনাকে ব্যথা দিয়েছি। তাই তো। আপনি কখনওই খালাসি হতে পারেন না। সত্যি আপনি কী বলুন তো ? জাহাজ সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই।'

'আমি যা-ই হই না কেন, আপনার লজ্জা বা দুঃখ পাবার কোনও কারণই নেই।'

'কিন্তু আমি যে সোশ্যাল ওয়ার্কার তা আপনাকে বলেছি। বলিনি ? সুতরাং ন্যায়ত আপনার কাজ-কর্মের কথাও আমাকে বলা আপনার উচিত।'

'সে কথা ঠিক,' শুভম বলে, 'আমি জাহাজের এঞ্জিনিয়ার আর কি।'

'ও হো, ম্যারিন এঞ্জিনিয়ার আপনি, তাই তো, এই সহজ কথাটা আমার মাথায় আসেনি। আপনি তো তা হলে খুব ভাল পাত্র ? জাহাজে ওরা খুব ভাল মাইনে-পত্তর দেয় শুনেছি।'

'ভাল মাইনে-পত্তর হলেই ভাল পাত্র হয় বুঝি ?'

'প্রধান ফ্যাক্টর তো ওটাই। তা ছাড়াই আপনাকে সুস্থ সবল এবং স্বাভাবিকও তো মনে হচ্ছে ? আর কী চাই ?'

'আপনার হাতে অনেক পাত্রী বুঝি ? আপনি কি কফি-হাউজে পাত্র খুঁজতে এসেছিলেন ? এই কি আপনার সোশ্যাল ওয়ার্ক ?'

এতোগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে করে ফেলেই শুভম বুঝতে পেরেছিল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। না জানি ভদ্রমহিলার কী প্রতিক্রিয়া হয়।

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রমহিলা হাসিমুখে বললেন— 'আপনি যদি আমাকে মালবিকাদি বলে ডাকেন, তা হলে আমি আপনাকে শুভম বলে ডাকতে পারি তো ? না আবার শুভবাবু-টাবু বলতে হবে ?'

'না না শুভবাবু-টাবু আমাকে কেউ বলে না। হয় বলে শুভম, নইলে বলে সরকার।'

'তবে এই নিন, পান নিন শুভম'— মালবিকাদি পানের ডিবে বার করে, সযত্নে সরু করে সাজা পানের দুটো খিলি এগিয়ে দিলেন।

'আপনি কি পানাসক্ত ?' শুভম জিজ্ঞেস করে— 'কিন্তু বোঝা যায় না

তো ?'

'পানাসক্ত আমি ঠিকই। কিন্তু পানে খয়ের দিই না কখনও। তা ছাড়াও দাঁত সম্পর্কে সতর্ক আমি।'

'বা, আমরাও যদি এমনি হতে পারতাম'— শুভম আক্ষেপ করে।

'লবঙ্গ ছোট এলাচ একসঙ্গে চিবিয়ে নেবেন, আর এই পানের পাতা যদি একটু চুন লাগিয়ে চিবিয়ে নেন, তা হলে তো আরও ভাল। গন্ধ পাওয়া যাবে না।'

'মানে বলছেন পান স্কোয়্যার ?'

'যা বলেন। তা আপনার বাড়ি কি খুব কনজারভেটিভ ? জাহাজের লোকেদের তো শুনি...'

'আর বলবেন না। আপনি একজন বাইরের লোক হয়ে বোঝেন, আর আমার মা বাবা এঁরা বোঝেন না। একদম। বাবা বলেই দিয়েছেন—কোনও ছুতোতেই মাতাল দাঁতাল হওয়া চলবে না। মায়ের কথা যদি বলেন, এমন আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি মা আমি দেখিনি। ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে যে মদ ছুঁতে পারে তা তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না। অথচ ম্যারিন...বুঝলেনই তো।'

'হুঁ, আপনার খুব প্রবলেম।' মালবিকাদি ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন— 'এবার আমায় উঠতে হচ্ছে। চলি, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল ভাই সরকার।'

'উঠছেন ?' রাজ্যের হতাশা ঝরে পড়ে শুভম-এর গলা থেকে।

'এই যে পাত্রীর কথা বলছিলেন ? আপনারাও কি আমার মায়ের মতোই কনজারভেটিভ ? ম্যারিন শুনেই পিছিয়ে গেলেন।'

মালবিকাদি হাসিমুখে বললেন— 'পাত্রীর কথা আপনিই বলছিলেন ভাই, আমি তো বলিনি।'

'সে কী ? এই যে বললেন সুস্থ, সবল আর কী চাই ! ভাল পাত্র—'

'তাই বলুন। আমি বলেছি পাত্রের কথা। কিন্তু কোনও পাত্রীর কথা আমি তো কখনোই বলিনি !'

হাসি-হাসি মুখে শুভমের দিকে চেয়ে আছেন মালবিকাদি।

'আচ্ছা তা যেন হল, আমিই না হয় পাত্র শুনে অবধারিতভাবে পাত্রীর কথা বলে ফেলেছি। কিন্তু আপনার এ রকম নামধামহীন হয়ে চলে যাওয়াটা আমার একটা লস বলে মনে হচ্ছে।'

'নাম তো আগেই বলেছি, মালবিকা সান্যাল। ধাম বলতে আমাদের সেন্টার হল শ্যামপুকুর স্ট্রিট, চুয়াল্লিশের বি—ওইখান থেকেই আমি অপারেট করে থাকি। যদি কিছু সমাজসেবা করতে চান...' মৃদু হাসি দিয়ে অসমাপ্ত বাক্যে ইতি টেনে, কাঁধে ব্যাগ, হাতে ফাইল মালবিকাদি চলে গেলেন।

শুভম বিদায় জানাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল, মালবিকাদি চেয়ার ছেড়ে একটু

এগোতেই সে মালবিকাদির পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়ে। দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে থাকতে নিশ্চয়ই কারও ভাল লাগে না। এবং দেখে মালবিকাদি সুনীল আঁচল বাঁহাতের কনুইয়ের ওপর দিয়ে ন্যস্ত করে কেমন সোজা সতর্ক ভঙ্গিতে একটার পর একটা ধূমায়মান জটলা পার হয়ে চলে যাচ্ছেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে মালবিকাদি পেছন ফিরে এক বার হাতটা নাড়লেন, মুখে হাসি।

ইস্ মালবিকাদির চেয়ারের সিটটা এখনও গরম হয়ে আছে। ঠিক ওঁর দরদী মরমী মনটুকুর মতোই নরম গরম। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতো সুন্দর আলাপ কারও সঙ্গে হতে পারে, বিশেষ, কোনও মহিলার সঙ্গে শুভমের যেন ধারণাতেও ছিল না। কী চমৎকার ভদ্রমহিলা। মালবিকাদি আহা মালবিকাদি...। মালবিকা, মাধবিকা, মাধুরিকা, মানসিকা...শুভম আরো এক কাপ কফির অর্ডার দেয়। আলাপ সালাপ একা হলেই জমে ভাল, তুমিও একাকী আমিও একাকী। এই যদি এখন তার বন্ধু রাধেশ্যাম পেছনে থেকে এসে তার বিরাট ধ্যাবড়া পাঞ্জা দিয়ে তার কাঁধে থাবড়া কষাত 'কিরে স্ শালা, খোঁয়াড়ের ভেড়া খোঁয়াড়ে ফিরেছিস তা হলে ?'

কী হত ? ঘড়ঘড়ে গলায় বকবক করে যেত রাধেশ্যাম। মালবিকাদি উঠে যেতেন, ওরা লক্ষও করত না। খানিকটা সময় অনর্থক ভ্যাড়ভ্যাড়ানি। সে কত টাকা উপায় করে, মাসে হাজার টাকা করে রাধেশ্যামকে দিক না, আফটার অল সে-ই তো নিজের সীটটা ছেড়ে দিয়ে শুভমকে ম্যারিনে চানস দিয়েছিল ! তা না-ই দিক, ও রকম স্যাক্রিফাইস রাধেশ্যাম অনেক করেছে, টুইশ্যনি করেই রাধেশ্যাম পর্ণশ্রীতে ফ্ল্যাট কিনেছে, বেলেঘাটায় ফ্ল্যাট কিনেছে। সে কারও কড়ি ধারে না। মারোয়াড়ি বাড়িতে বাঁধা টুইশ্যনি রাধেশ্যামের। সরকারি চাকরি। হপ্তায় এক দিন হাফ ডুব আরও দু দিন ফুল ডুব দিয়ে রাধেশ্যাম চালিয়ে যাচ্ছে। পুরো সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ জুড়ে রাধেশ্যামের বাজার। এক এক বাড়িতে নটা দশটা করে বাচ্চা পড়ায়। ন দশ হাজার করে ফিজ পায়। এই সব গপ্পো মারতে মারতে সময়টা কেটে যেত ঠিকই, কিন্তু মুখে একটা বাজে স্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরতে হত। মেজাজটা থাকত চড়ে। সুমিতার সঙ্গে রাত রোম্যান্সটা জমত না। একেই তো মেজাজি মেয়ে।

'খেয়ে এসেছ ? দাড়ি কামাওনি ? চুল এত চিপচিপে কেন ? শ্যাম্পু করতে পারো না ? আবার রাধেশ্যামের সঙ্গে আড্ডা মেরেছ ? সারা গা দিয়ে রাধেশ্যাম-রাধেশ্যাম গন্ধ ছাড়ছে।'

অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তি সুমিতার।

'রাধেশ্যাম-রাধেশ্যাম গন্ধ যে করছো ? গন্ধটা চিনলে কী করে ?'

'এই, খবর্দার বাজে কথা বলবে না। রাধেশ্যামের গন্ধ ঘাম, লাড্ডু, ভুজিয়া, মালাই, নস্যি, বাংলু আর খারাপ পাড়ার গন্ধ—সবাই চিনবে। আমি সাইকলজির লোক। আমার কাছে চালাকি নয়।'

'সাইকলজির লোক' ব্যাপারটাকে সুমিতা তার একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার

করে, সব রকমের মোকাবিলায়। এবং ওই বাক্যাংশটি সুপার হিট। 'সাইকলজির লোক' মানেই যেন তার চোখের সামনে মানবচরিত্র খোলা পড়ে আছে। সে যা বলবে সব্বাইকে তা মেনে নিতে হবে। এ ব্যাপারে যদি শুভম পয়লা রাত্তিরেই বেড়াল মারতে পারত, কোনও ঝামেলা হত না। কিন্তু তা সে পারেনি। তার মতো একদা-ফেলুটস আড্ডাবাজ ছোকরার যে সাইকলজির অধ্যাপিকা গুচ্ছের মাইনে পাওয়া স্বাধীনচেতা অথচ লিচুর মতো নরম রসালো বউ জুটবে তা সে ভাবতেও পারেনি। অধ্যাপিকা শুনে প্রথমেই সে প্রস্তাবটা বাতিল করে দিয়েছিল। তার মা-বাবা তখন হন্যে। এই রে ছেলে জাহাজে চড়ে ভেসে গেল বয়ে গেল বুঝি, চরিত্রহীন হবার সব রকম উপাদান না কি এ চাকরিতে আছে। তাঁরা বললেন— 'অধ্যাপিকার যোগ্য তুই নোস আমরা জানি। তবু, বেড়ালের ভাগ্যেও তো শিকে ছেঁড়ে ! মেয়েটিকে এক বার দেখে, আলাপ করেই আয় না।'

শুভম তখন প্রথম সফর সেরে এসেছে। খুব কাঠখোট্টা। সুমিতার দিদির দেওর তার বন্ধু। সেখানেই সুমিতার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। বন্ধু নিলয় তাকে ড্রয়িং রুমে বসাল 'চা খাবি না কফি ?'

'কফি',

'দাঁড়া বলে আসি।'

নিলয়ও বলে এল, একটি সালোয়ার কামিজ পরা কিশোরীও কফি নিয়ে ঢুকল।

শুভম তখন ভীষণ যাকে বলে এস্মার্ট। সে কফির কাপ তুলে নিয়ে খুব স্টাইলের মাথায় বলল— 'তোমার সঙ্গে পরে আলাপ করব। আগে তোমার দিদিকে ডেকে দাও।'

নিলয়দের বাড়ির সবাইকে সে চেনে ; এ মেয়েটি নতুন, অর্থাৎ তার অধ্যাপিকা দিদির সঙ্গে মজা দেখতে হাজির হয়েছে—এমনটাই তার ধারণা।

মেয়েটি মিটিমিটি হেসে বলল— 'আমিই আমার দিদি।' এবং নিলয় অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল।

শুভম বোকার মতো বলল— 'আমি ভেবেছিলুম আপনি হায়ার সেকেন্ডারি-টারি পড়েন।'

'অসাবধান মুহূর্তে সাবকনশাস তো ঠেলে উঠবেই। আসল কথা আপনি অ্যাভারেজ বাঙালি কুমারের মতো শ্যালিকায় বেশি ইন্টারেস্টেড।' নিলয়ের হাসি আরও বেড়ে গেল।

'কিন্তু আমিই আমার দিদি আমার বোন সবই, দুঃখিত।'

দুঃখিত বললেও দুঃখের কোনও ছায়া-ছবি দেখা যায়নি সুমিতার মুখে।

মাথায় ঝাঁকড়া এক ঝুড়ি চুল, লিচু-লিচু মুখ, কাজল-পরা-শয়তান-শয়তান চোখ, হাসি-উপছে পড়া ঠোঁটের এই পাঁচফুটি সালোয়ার কামিজ নাকি এক্সপেরিমেন্টাল সাইকলজিতে এম এসসি, একটা মহিলা কলেজের অধ্যাপনায়

ঢুকেছে।

তারপর নিলয়ে সুমিতায় শুভমে যে জমজমাট আড্ডাটা হল, সেটা রাত্তির নটা পর্যন্ত যখন গড়ালো তখন শুভম সুমিতাকে সুমিতা বলছে। সুমিতা শুভমকে শুভম বলছে, মালানি ব্র্যান্ডো, ইউল ব্রিনার, অড্রে হেপবার্ন সম্পর্কে মতামতের আদানপ্রদান হয়ে গেছে। শুভম এবং নিলয়ের পাহাড় ভাল লাগে, সুমিতার সমুদ্র। সুমিতা শীত ঋতুর ভক্ত, কেননা বেড়ানো যায়, নানা রং পরা যায় শুভমের বর্ষা ভাল লাগে বাড়ি ফিরতে দেরি হলে কেউ রাগারাগি করে না বলে, সুমিতা শ্যাম্পেন এবং পোর্ট চাখতে চায়, জিন উইথ লাইম ছাড়া আজও কিছু খায়নি, ড্রাই মার্টিনি কাকে বলে জানতে আগ্রহী, সুবোধ ঘোষ আর পরশুরামের দারুণ ভক্ত, শুভম নারায়ণ গাঙ্গুলির টেনিদার। সুমিতার এক্সপার্ট ওপিনিয়ান—শুভমের মেন্টাল এজ বালকের। এবং এই রকম বালক-বালক লোককে ট্যাকল করতে তার দারুণ লাগবে বুঝে শুভম পুলকিত।

শুভম এখনও বউয়ের বাৎসল্য এবং মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের ছায়ায় ছায়ায় রয়েছে। সমুদ্রযাত্রার সময়ে সুমিতা তাকে বাছা বাছা গল্পের বই, বাছা বাছা ফটো গুছিয়ে দেয়। যত কান্না পায় তত বেশি হাসে, যত মন মরা হয় তত লাফায় ঝাঁপায় এবং মুখ ঝামটে ঝামটে বলতে থাকে 'তোমার আর কী! কত দেশ দেখবে, জাহাজও তো একটা রাজপুরী বিশেষ। ভাল ভাল খাবে, তরল চলবে খুব...আমারই মুশকিল।'

আসলে কিন্তু উল্টো। শুভম দেখে শুধু জল, জল আর জল, ডাঙা যখন আসে তখন নিজেকে পরিত্যক্ত, পরিচয়হীন, অবান্তর লাগে, দিনের পর দিন স্টোরেজের খাবার খেয়ে খেয়ে ক্রমশ খাবার ইচ্ছে চলে যায়, ভাল ভাল তরল সে খেতে পায় ঠিকই কিন্তু অনীশ, সুমন, প্রদীপ, নিলয় ইত্যাদি বন্ধুদের সঙ্গে খাওয়ার মজা আলাদা। আর এদিকে সুমিতা? শ্বশুর-শাশুড়ি মা বাবা দিদি জামাইবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় দিব্যি থাকে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে মেরে এখন রকে বসলেই হয়। সাজছে গুজছে, কলেজে পড়াবার নাম করে গিয়ে কলীগ ছাত্রী সব্বার সঙ্গে আড্ডা মেরে আসছে, থিসিস-ফিসিস লিখছে আর বর নেই বলে সবাইকার সহানুভূতি কুড়োচ্ছে। তার ওপর এই কন্যা দুটি হবার পর থেকে তো সুমিতার পাত্তাই পাওয়া যায় না। বালিকা দুটিকে প্যারাগন করে তুলতে সুমিতা বদ্ধপরিকর। তার মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পুরো বেনিফিটও সে মেয়েদের দিতে চায়।

আহা, মালবিকাদির মতো স্নেহশীলা দরদিনী কেউ যদি তাদের পরিবারে থাকত! মাঝে মাঝে মনে পড়ে মালবিকা সান্যালের মুখ...উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জোৎস্নায় নীরবে উড়ুক।

আরও খানিকটা ঘুরে ঘেরে রাত্তির নটা করে শুভম বাড়ি ফেরে।

সুমিতা চান সেরে পাউডারে সাদা হয়ে একটা হাফ পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে হাতে ঠাণ্ডার গেলাস নিয়ে বসে। বড় মেয়ে দেবাঞ্জলি এখনই সুমিতার

থেকে লম্বা হয়ে গেছে, ধরণধারণও ভাবুক, গম্ভীর-গাম্ভীর, সে সুমিতাকে একটি ছোটখাটো লেকচার দিচ্ছে মনে হয়, এবং সুমিতা মুখ উঁচু করে শুনছে। আম্রপালী ঘরের আরেক দিকে মেঝেতে গুচ্ছের রং তুলি ছড়িয়ে আঁকায় মগ্ন। ঘরে ভাল করে পা দিয়ে শুভম বুঝল দেবাঞ্জলি কোনও পার্ট মুখস্থ বলছে, লেকচার দিচ্ছে না। অর্থাৎ অভিনয়-টয় আছে আর কি কোথাও। তবে লেকচার দিলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। কার মেয়ে দেখতে হবে তো।

শুভমকে দেখেই তিনজনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আঁকা ফেলে আম্রপালী উঠে এসে বাবার হাত ধরে টানতে থাকে। দেবাঞ্জলির মুখস্থ বলা শেষ হয়ে গেলে সুমিতা বলে— 'জল থেকে ডাঙায় তুললেই তুমি খাবি খেতে থাকো, না? —নটা বেজে গেল, কোথায় গিয়েছিলে? মা খাবার নিয়ে বসে আছে।'

'ওহ্ তোমাদের সবাইকার খাওয়া-দাওয়া শেষ?'

'মেয়েদের হয়ে গেছে, আমি তোমার জন্যে পেটে কিল মেরে বসে আছি।' নাহলেই তো আবার রাগ হবে। উঃ কী দারুণ খিদে।' সুমিতা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল।

দেবাঞ্জলি একটা ফুলকাটা হাউজকোট এগিয়ে দেয় মায়ের দিকে। সেটাতে হাত গলিয়ে সুমিতা নাক কুঁচকে বলে 'পান খেয়েছ মনে হচ্ছে? খাওয়া-দাওয়া সেরে এলে নাকি?'

'কোনও কোনও পান খাওয়া দাওয়ার আগেই খাওয়া যায়।'

'সে পান নয়, আমি পোস্ট-ডিনার সলিড পানের গন্ধ পাচ্ছি।'

'একটা পান আমি খেতে পারি না?'

'না, তা পারবে না কেন, অবশ্যই পারবে।' —সুমিতা খুব সন্দেহের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নাক বটে একখানা। শুভম মনে মনে বলে। রাধেশ্যাম-রাধেশ্যাম গন্ধ, এবার কি মালবিকাদি-মালবিকাদি গন্ধ বলবে?

তাকে অবাক করে দিয়ে সুমিতা বলে— 'পানটা কোনও দোকানের নয় এটুকুই "সাইকলজি'র লোক' হিসেবে তোমাকে বলতে পারি।" এবং তাকেও অবাক করে দিয়ে শুভম বলে— 'ঠিকই বলেছ। মালবিকাদি দিয়েছে।' বলেই শুভম হাত মুখ ধুতে চলে যায়।

যাদু ঘোষের স্ট্রিটে

যাদু ঘোষের স্ট্রিটে কদিন ধরে মহাবিপদ যাচ্ছে। ধাঙড় স্ট্রাইক। অন্যান্য পাড়াতেও নিশ্চয়ই এই একই বিপদ। কিন্তু যাদু ঘোষের স্ট্রিটের কথা আলাদা। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নিরুপম গড়াই কি অন্য পাঁচজন কাউন্সিলরের মতো? তিনি আলাদা। চার দিন স্ট্রাইক সহ্য করবার পর নিরুপম

পাড়ার ছেলেদের তলব করেছেন।

যাদু ঘোষের স্ট্রিটটি একটি সার্পেন্টাইন লেন বিশেষ। সরু হতে পারে কিন্তু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নানা বিস্তৃততর স্ট্রিট পার হয়ে সার্কুলার রোডের সঙ্গে সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউকে জুড়েছে। কলেজ স্ট্রিট পার হবার পর তার নাম বদলে গেছে ঠিকই। কিন্তু আদতে এরা যে একই স্ট্রিট এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত এক বার হাঁটলেই যে-কেউ বুঝতে পারবে। নিরুপম গড়াই কাউন্সিলরের ওয়ার্ডের মধ্যমণি এই রাস্তা। এখানে কেউ পানের পিক বা থুতু ফেলে না, দেওয়ালে পোস্টার সাঁটে না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে জলবিয়োগ করে না। পাড়ার লোকেরা সবাই জানে এবং সবাই মানে এ সব। বেপাড়ার কোনও পথিক যদি অভ্যাসবশত রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যান, ওপর থেকে বালতি বালতি জল পড়ে। পাড়ার সবাইকে ঢালাও অনুমতি দেওয়া আছে। ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করবার উপায় নেইঃ জল পড়ার ঝপাং শব্দ হওয়া-মাত্র হয় মহিলাবাহিনী নয় বালকবাহিনী বেরিয়ে আসে। এই বাহিনীর পুরোভাগে সাধারণত থাকে চৌধুরীবাড়ির কাজের লোক অনিলামাসি। মাসির উবুঝুঁটি খোঁপা, হাতে ঝাঁটা হোক বালতি হোক ঝুলঝাড়া হোক কোনও না কোনও অস্ত্র, বঁটিও অনেক সময়ে থাকে। মাসি কাউকে খাতির করে না। যত ভদ্রবেশী, যত ফর্সাই হোক না কেন দুষ্কৃতকারীকে মাসি রেহাই দেয় না।

'কী ছোটলোক গা তুমি, ভদ্দরলোকের বাড়ির গায়ে ছচ্ছড় করে মুতে দিলে ? কেন নিজের বাড়িতে কলঘর নি ? কলঘরও নি ! লজ্জাও নি !'

এক বার এক স্থানীয় স্কুলের প্রৌঢ় মাস্টারমশাই, দুপুরবেলা শুনশান দেখে দাঁড়িয়ে গেছিলেন। হঠাৎ তাঁর সামনের জানলাটা খুলে যায় এবং একটি বাল-মুখ বেরিয়ে পড়ে।

'মাস্টারমশাই !' —আনন্দিত বিস্ময়ে সে বলে ওঠে, এবং তার বন্দিত মাস্টারমশাইকে দেখবার জন্য মাকে ডাকতে থাকে।

'মা, ওমা দেখে যাও আমাদের ভূগোলের স্যার।'

ভূগোলের স্যার সেবার ভড়কে চমকে অজ্ঞান হয়ে যান। সেই ছাত্রের বাড়িতেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসাদি হয়। কিন্তু জ্ঞান আসবার পরেও তিনি অজ্ঞান থাকার ভান করে চোখ বুজে মড়ার মতন পড়েছিলেন, যার ফলে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকেই তিনি নাক-কান মুলে পালিয়ে যান।

যাদু ঘোষের স্ট্রিটের দু ধারে গাছপালা, বড় জালের খাঁচায় মুনিয়া পাখি, একটি মাছের অ্যাকোয়ারিয়াম পর্যন্ত শোভা পাচ্ছে। পাড়ার বয়স্করা অনেক সময়েই মোস্তেড চেয়ার নিয়ে রাস্তায় বসেই গল্পসল্প করে থাকেন। এই পাড়ায় চারদিন ধরে ময়লা জমাটা যে কলকাতার মতো সর্বংসহা নগরীতেও একটা ভীষণ ব্যাপার বলে গণ্য হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ভোর ছটাতেই লাউডস্পীকারে নিরুপম গড়াইয়ের গলা ভেসে ওঠে— 'বন্ধুগণ, ভাই সব, ছোট

ভাইয়েরা, আমাদের ছেলেমেয়েদের, মা বোনেদের, বাবা-কাকা-জ্যাঠাদের স্বাস্থ্য বিপন্ন। যে কোনও সময়ে মহামারী দেখা দিতে পারে। ভগিনী নিবেদিতা এক জন বিদেশিনী মেমসায়েব হয়ে যদি ভয়াবহ প্লেগের মড়কে বাগবাজারের রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে থাকতে পারেন, আমরা যাদু ঘোষের স্ট্রিটের অধিবাসীরাই বা পারব না কেন। আমরাও কি নিবেদিত নই ? সেলফ-হেল্প ইজ দা বেস্ট হেল্প, দরকার পড়লে আমরা ধাঙড় হয়ে ভাগাড় পরিষ্কার করব, আবার দরকার হলে ভাংরা নেচে আসর জমাব। আমরা সব কাজের কাজি। ভাই সব ক্লাবঘরে গ্লাভস, বেলচা, হুইলব্যারো সব রেডি। তোমরা সব কাজে নেমে পড়ো। নাকে মুখে যে যার রুমাল বেঁধে নাও।'

এর পরে নিরুপম গড়াই অর্জুনা রণতুঙ্গার মতো হাত নেড়ে নেড়ে ডাইনে বাঁয়ে বাহিনীকে নির্দেশ দেয়। তার পরিচালনায় বল্লেবাজ এবং গেনবাজরা স্কোর করতে থাকে এবং আউট করতে থাকে, এক বেলচা, দু'বেলচা, তিন বেলচা। গাড়ি-ভরতি করে ময়লা তুলে নিয়ে ওয়ার্ডের বাইরে এক বিস্তৃত আবর্জনা স্তূপে ফেলে আসা হয়, শেষ হলে ঘর্মাক্ত কলেবরে সবাই নিরুপমদার পাশে দাঁড়িয়ে যায় সার সার, নিরুপম আবার মাইক্রোফোনে ঘোষণা করেন— 'পল্লীর সমস্ত বাড়িতে অনুরোধ আবর্জনা এখন আর বাইরে ফেলবেন না, ঘরেই জমান, এবং সন্ধের পর ওয়ার্ডের বাইরে ফেলে আসুন।'

বেলা তখন দেড়টা, ঘোষণাটি শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে নিরুপম এবং সমবেত ছেলেদের মাথার খই এবং পুষ্পবৃষ্টি হল। নিরুপমের বাড়ির সামনেই মাইক্রোফোনটি ফিট করা আছে, তাঁরই বাড়ি থেকে পুষ্প এবং লাজবৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই। অন্যান্য বাড়ির বাতায়নলগ্নারা নীচের বীরদের দেখতে এবং বাহবা দিতে এমনই মত্ত যে নিরুপমের বাতায়নের দিকে কেউ চাইবার অবসর পাননি। তবে প্রেরণা পেয়ে তাঁরাও শাঁখ বাজালেন, অনেকে উলু দিলেন। সে এক রই রই ব্যাপার। শত শঙ্খ বাজছে, দুইশত মুখে হুলুধ্বনি। পাশের গলি থেকে অনেকেই ছুটে এল, 'এখানে কি কোনও গণ-গায়ে-হলুদ হচ্ছে ?' এই তাদের জিজ্ঞাসা। স্বাভাবিক। একটি বাড়ির বিবাহোৎসবে তো এই রকম হুলুস্থূল ব্যাপার হওয়া সম্ভব নয়।

এই সময়ে মাইক্রোফোনে নিরুপম-কণ্ঠের গর্জন শোনা গেল 'কী হচ্ছেটা কী ? রঞ্জু-উ শেফালি-ই-শান্ত-ও।'

নিরুপমের খেয়াল নেই সামনে চালু মাইক্রোফোন। ছেলে শান্ত পাশেই প্রকৃত শান্ত এবং গলদঘর্ম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ কিছুক্ষণ আগেকার টুর্নামেন্টে সে ছিল একজন অতি দক্ষ ফিল্ডার। সে আরও ভুলে গেছে যে রঞ্জনা তার লেখক-স্ত্রী (লেখিকা বললে রঞ্জনা ক্ষুব্ধ হয়) আপাতত যাদু ঘোষের স্ট্রিটে নেই। কী এক রহস্যময় লেখার তাগিদে সে এই বৈশাখী গরমে শান্তিনিকেতনে গেছে।

এতক্ষণের কাজকর্মের গম্ভীর আবহাওয়া মুহূর্তে ভেঙে যায়। চারপাশ

থেকে হাসির রোল ওঠে। এবং নানা জানলা থেকে খই অভাবে চিঁড়ে মুড়ি বৃষ্টি হয়। ছেলেরা হই-হই করে ওঠে, মারমুখী ইয়ং জনতা এক। "আমরা এত কষ্ট করে রাস্তা পরিষ্কার করলুম, এখন আবার আবর্জনা ফেলে রাস্তা নোংরা করা হচ্ছে ?' পাড়ার বড়রা মধ্যস্থতা করেন— 'আহা হা, আনন্দ করছে মেয়েরা, একটা শুভ অনুষ্ঠানে পরিণত হল তোমাদের প্রশংসনীয় কাজটা।'

মেয়েরা বললেন— 'চিড়ে মুড়ি খই ফুল আবর্জনা এ কথা আমরা জন্মেও শুনিনি।'

নিরুপম নারীদের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন— 'প্রত্যেক বাড়ি থেকে এক জন অন্তত মহিলা নেমে এসে সকলে মিলে এই চিঁড়ে মুড়ি খই ফুল ঝেঁটিয়ে বিদায় করুন। আর যদি জিনিসগুলি খুব শুভ বলে মনে হয় তো নিজেদের উদ্যোগে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসুন।'

বুড়োরা হাঁ হাঁ করে উঠলেন— 'গঙ্গার দূষণ আর কত বাড়াবে নিরুপম ?' উত্তরে নিরুপম বলেন— 'তা হলে ওগুলো ফলার করে খেয়ে ফেলুন।'

নিরুপম আর দাঁড়ান না। ছোকরা বয়স তো আর নেই, যে পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে ফক্কুড়ি মারা মানাবে ? চেহারাটা চিরদিনই পাতলার ওপর, ঠোঁটের ওপর একটি কার্তিক-গোঁফও আছে, চুলটাও বাবরি। এই জন্যেই কি কেউ কোন দিন তাঁকে সিরিয়াসলি নিল না ? না নিল তো কাউন্সিলর হলেন কী করে ?

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বাড়ির উঠোনে ঢুকেই নিরুপম গর্জন করলেন— 'শেফালি !'

'শেফালি রাস্তায় খই কুড়োতে গেছে, যা বলবার আমাকে বলুন !'

বিনীত-ললিত একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে নিরুপমের সামনে। মহিলা ? না মেয়ে ? মেয়েই। শাড়ির আঁচল আঙুলে পাকায় তো মেয়েরাই। লজ্জাবনত মেয়েরা। কবে ? হায়রে কবে কেটে গেছে লজ্জাশীলার কাল।

'আপনি...আপনি কে ?'

শান্ত বলে উঠল— 'ও তো শিল্পী মাসি। মায়ের বন্ধু। কখন এলে মাসি ! তুলতুল আসেনি ?'

'রঞ্জু তো নেই !' নিরুপম কী রকম বোকার মতো বলে ফেলে।

'সেটা আমি জানতাম না। আমি চলেই যেতাম, কিন্তু...' নিরুপম ভীষণ লজ্জিত হয়ে বলে— 'না, না, চলে যাবেন কেন ? চলে যাবার কী আছে ? আমি তা বলিনি।'

'চলে নিশ্চয়ই যেতাম, রঞ্জুদি না থাকলে এখানে আর আমার...' কিছুটা কথা অসমাপ্ত রেখে শিল্পীমাসি বলে— 'আসলে এমন একটা জিনিস দেখলাম যে যেতে পারলাম না। এ রকম কখনও দেখিনি তো ! আপনাদের মানে আপনার ওই আবর্জনা হটানোর ড্রাইভটা...এ রকম ব্যক্তিত্ব এরকম লীডারশিপ, এ রকম অর্গ্যানাইজেশন এখনও আছে...তবু আমাদের এই দুর্দশা কেন ? বেশিদিন

থাকবে না—বেশিদিন থাকবে না...'

শ্রদ্ধামুগ্ধ চোখ তুলে যেন দিন আগত ওই চোখ দিয়ে গাইতে গাইতে শিল্পী ঘাড় নাড়তে লাগল।

এত শ্রদ্ধা, এত আশার সামনে নিরুপম ঠিক লজ্জা পেতেও পারছে না, 'কী যে বলেন !' জাতীয় কথাই তার সর্বাগ্রে মনে এসেছিল। কিন্তু সেটা গিলে নিয়ে সে বেশ সন্তোষের সঙ্গে হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল— 'কাউকে তো শুরু করতেই হয়। কেউই যদি কিছু না করে তা হলে...'

'এগজ্যাক্টলি'—এখন শিল্পী অনেকটা টান-টান—'কিন্তু কে শুরু করবে ? এই যে দেশ-ভরতি নাগরিকের দায়িত্ব-জ্ঞানের অভাবের বেড়াল তার গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ? কেউই তো এগিয়ে আসে না নিরুপমদা ! হংকংএ এই সব অপরাধের জন্য পাবলিক ফ্লগিং হয়, জানেন ? আমি নিজে দেখেছি।'

নিরুপম শ্রাগ করে বলল— 'তবেই বুঝুন।'

'আচ্ছা, আমি এখন যাই ?'

'সে কী ? এই দেড়টা দুটোর সময়ে আপনি না খেয়ে চলে যাবেন ? বাইরে রোদ্দুরও খুব।'

শেফালি নিরুপমের পেছন থেকে বলল— 'তার ওপর শিল্পীদিদি তো আজ রান্নাও করেছে। চলে যাবে মানে ?'

'আপনি...রান্না করেছেন ?' —নিরুপম হতবাক।

'আমি তো রোজই রান্না করি !' —শিল্পী সপ্রতিভ স্মিতহাস্যে বলে।

'তা অবশ্য করতেই পারেন ?' নিরুপম হাসে, 'যদিও সবাই মানে সব মেয়ে করে না, যেমন আপনার বন্ধু রঞ্জুদি, সে শেফালি নামে ওই মেয়েটির ওপর বরাত দিয়ে রেখেছে, যে নাকি অনেক সময়েই অখাদ্য রাঁধে, তা সে যাই হোক আপনি এখানে এসে রান্না করেছেন ?'

শেফালি মুখিয়েছিল, বলে উঠল— 'আমি অখাদ্য রাঁধি বলেই তো বউদির বন্ধুরা যেদিন আড্ডা থাকে সেদিন রান্না করে নিয়ে আসে। সবাই অবশ্য নয়। কাজলদিদি গোবরঘণ্ট আর জল-ভাত ছাড়া রাঁধতে পারে না, সুমিতাদিদিও হেভি ফাঁকিবাজ, তবে শিল্পীদিদি আর মালুদিদি হেরভি রাঁধে। কিন্তু মনে রেখো দাদা, আমি যদি অখাদ্য রাঁধি তো শিল্পী দিদি রাঁধে—কুখাদ্য। শুয়োর গরু এই সব।'

'তুই চুপ করবি ?' নিরুপম এক হাঁকার ছাড়ে—তারপর শিল্পীর দিকে তাকিয়ে বলে 'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

শিল্পী বলল— 'একটু পাখার তলায় গিয়ে বসলে হত না ?'

'নিশ্চয়ই, ছি ছি' —নিরুপম বসবার ঘরের দিকে এগোয়।

সেই ঘর, যেখানে দিন দশেক আগে জমাট আড্ডা বসেছিল। যেখানে মালবিকাদি আবৃত্তি করেছিল 'দেশে দেশে মোর বউ আছে আমি সেই বউ মরি খুঁজিয়া।' যেখানে সুমিতা শেফালিকে আনকাট ডায়মন্ড বলে শনাক্ত করে,

এবং শেফালি তার ফেভারীট গান শনাক্ত করে 'ধক ধক ধক ধক'। হঠাৎ শিল্পীর ভীষণ হাসি পেয়ে গেল, সে দমকা হেসে উঠল। কিছুতেই সামলাতে পারল না। নিরুপম অবাক, একটু অফেন্ডড-ও।

এত হাসির কী হল ? হঠাৎ ?

শিল্পী তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল— 'ওই কুখাদ্য। শেফালি বলে মেয়েটি আপনাদের খুবই রসিক।'

'শেফালি আমাদের মেয়ে নয়, মিসেস শিল্পী... ?'

'বরাট।'

'আচ্ছা বরাট, ওকে বড়জোর "কাজের মেয়ে" বলা যেতে পারে, এই করে করেই এদের মাথায় তুলেছেন আপনারা, কেন 'মহানগর'-এ অনিল চ্যাটার্জির মা "ঝি অ ঝি" বলে ডাকেননি, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ? কল আ স্পেড আ স্পেড।'

শিল্পী অবাক হয়ে বলে— 'এই যে শুনেছিলুম আপনি কমিউনিস্ট ?'

নিরুপম চট করে নিভে যায় বলে— 'ঘরসংসারের ডে টু ডে প্রবলেমে ব্যাপারটা সব সময়ে মনে থাকে না, বুঝলেন না মিসেস ...'

'কী আশ্চর্য, আমাকে শিল্পী বলুন, আমি রঞ্জুদির বন্ধু, কিন্তু অনেক ছোট। আপনি তো দেখছি মধ্যযুগের মানুষ, কাজের মেয়েকে ঝি বলেন, স্ত্রীর বন্ধুকে মিসেস বলেন, শুনেছিলাম বটে উত্তরের লোকেরা একটু ব্যাকডেটেড। এখন দেখছি সেটা সত্যি।'

শ্রদ্ধা বিনয় নম্রতা বীরপূজার মুখোশগুলো শিল্পীর আস্তে আস্তে খসে যেতে থাকে।

'দেখুন উত্তরের লোকেরা ব্যাকডেটেড। ঠিকই হিসটরিক্যালি, দে গো ব্যাক টু দা সেভেনটিনথ সেঞ্চুরি। তার আগেও কলকাতা ছিল। সুতানুটি অর্থাৎ উত্তর কলকাতাই আসল কলকাতা, খানদানি কলকাতা, অভিজাত, প্রতিভাবান সম্পদশালী। নবকৃষ্ণ দেব, রাধাকান্ত দেব, মন্মথ মিত্তির, মতি শীল এখানকারই ধনী। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, এখানকারই প্রতিভা, তারাশংকর, নীরেন্দ্রনাথ, বিকাশ ভট্টাচার্য, সমরেশ মজুমদার উত্তর কলকাতার গর্ব। বেশি কথা কি প্রেসিডেন্সি, স্কটিশ চার্চ, বেথুন কলেজ, হিন্দু স্কুল, হেয়ার স্কুল, শৈলেন্দ্র সরকার স্কুল সুবিখ্যাত সব রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা হল এখানেই এখানেই এখানেই।

'সাউথে এত ধনী যে হাতে গুনে শেষ করা যায় না নিরুপমদা। নেতাজি, সুভাষচন্দ্র আমাদের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ আমাদের, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, আধুনিক সাহিত্যের যত তা-বড় তা-বড় প্রতিভা সব ওদিকে। সুনীল গাঙ্গুলি আমাদের বাজারে বাজার করেন, শরৎকুমার, তারাপদ, সমরেন্দ্র, প্রণবেন্দু, বুদ্ধদেব গুহ, নবনীতা দেবসেন— এঁরা সব ওই সাউথের রাস্তা দিয়েই চলাচল করেন।... সুকুমারী ভট্টাচার্য, গৌরী

ধর্মপাল, কল্যাণী দত্ত, গোবিন্দ গোপালের মতো পণ্ডিতরা ...'

'শুনুন শুনুন শিল্পিতা ধনী হলেই হয় না, ধন পাবলিক কজ-এ ইউজ করতে হয়।'

শিল্পী চেঁচিয়ে ওঠে— 'বেড়ালের বিয়ে দিয়ে, হাউই জ্বালিয়ে, পায়রা উড়িয়ে ?'

'তা কেন হবে ? কালো রঙের টাকা উড়িয়েই তো ভাল...'

'ঝগড়া হয়ে যাবে নিরুপমদা, ভাল হচ্ছে না— স্যামবাজারের সসিবাবু তো আপনাদেরই কালচার ?'

'আর "আমি বসছি উইথ হাঁটু মুড়ে ভাই" কাদের কালচার ?

'জীবনানন্দকে কী দিয়েছে সাউথ ? রাসবিহারী তাকে অপঘাত মৃত্যু দিয়েছে। জীবনানন্দ সাউথের নয়। আর অন্যরা সব অভিবাসী !'

'অভিবাসী ?'

'সুনীল গাঙ্গুলি আমাদের এই টাউন স্কুলের ছেলে, শঙ্খ ঘোষ সল্টলেকের মুখে থাকেন, সুকুমার সেন আমাদেরই ...।

তা ছাড়া এঁরা বেশির ভাগই পূর্ববঙ্গের, আবার ফরিদপুর অঞ্চলের, নর্থ বেঙ্গলেরও আছেন। আর নেতাজিকে ধরে টানাটানি করবেন না শিল্পিতা— ভবানীপুরকে আমি সাউথ ধরি না। বহুবাজার টু ভবানীপুর, দি এনটায়ার স্ট্রেচ ইজ মধ্য কলকাতা।'

'নেতাজিকেও দেবেন না ?' বলে শিল্পী রাগে লাল হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

'কাম ডাউন, শিল্পিতা কাম ডাউন প্লিজ।'

'আমি শিল্পিতা-ফিল্পিতা নই। আমি শিল্পী। এখন চললাম।'

এতক্ষণে নিরুপমের চৈতন্য হয়। তার স্ত্রীর বন্ধু এই মেয়েটিকে সে সাংঘাতিক চটিয়েছে। মেয়েটি অতিথি। আতিথ্যের অবমাননা তো উত্তর কলকাতার আভিজাত্যের ভাল পরিচয় দেবে না। সে নিরুপায় হয়ে ডাকে—শেফালি, শান্ত, শেফালি, শান্ত', এবং শিল্পীর গমনপথ আটকে বলে—'রাগ করে না খেয়ে চলে গেলে গেরস্তের অকল্যাণ হয় শিল্পী।'

শিল্পী ফুঁসতে ফুঁসতে বলে—'না। আমি খাব না।'

ততক্ষণে শেফালি এবং শান্তও এসে পড়েছে। তারাও যথাসাধ্য শান্ত করবার চেষ্টা করছে শিল্পীমাসিকে। কিন্তু সফল হচ্ছে না। শিল্পীমাসির এখন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছে।

অনুতপ্ত নিরুপম কাঁচুমাচু মুখে বলে— 'আমি ক্ষমা চাইছি। ঠিক আছে নেতাজি আপনার। আর কাকে দিলে খাবেন বলুন ? দিব্যেন্দু পালিত ? ভাগলপুরের লোক কিন্তু দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি।

'ও সব জানি না যদি সিনেমা দেখান একটা আজকেই, এক্ষুনি, তবে খাব।'

'তো বেশ তো ! এই কথা ! নিশ্চয়ই দেখাব। কিন্তু এমন বিনা নোটিসে ফট করে টিকিট পাওয়া যাবে তো ?'

'আমি তো আর "হিন্দুস্তানি" কি "দিলওয়ালে দুলহনিয়া" দেখতে চাইছি না, 'দর্পণা'য় অপর্ণার যুগান্ত এসেছে— দেখান। শুনেছি রূপা-অঞ্জন ফাটিয়ে দিয়েছে।

শেফালি বলল— 'টিকিট পাওয়া যাবে দাদা, আমি একছুটে যাব আর আসব।'

'ড্রেস সার্কল কাটবি। টাকা নে।'

নিরুপম টাকা দিয়ে দেয়। শেফালি টেবিলে খাবার দাবার অনেকক্ষণ সাজিয়ে ফেলেছে। আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে বলে— 'এই শশার রায়তা, এই চিংড়ি মাছের পোলাও, এই পনীরের মাখন-কাবাব। শিল্পী দিদি করেছে। আর এই বিউলির ডাল, এই সুক্তুনি, পোস্ত দিয়ে লাউশাক, আর বাটা মাছের সর্ষে ঝাল, ভাজা— আমি, ঝি, করেছি।' —বলে শেফালি মটমট করে বেরিয়ে যায়।

সব দিক থেকে পরিশ্রান্ত, পরাজিত নিরুপম গড়াই অতএব মাথায় জল ঢালে আর জল ঢালে। জল ঢালে আর জল ঢালে। চমৎকার একটি প্রায় অপরাহ্ণ-ভোজের পর নিজে আদ্দির পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে বর সেজে সুসজ্জিতা শিল্পীর সঙ্গে ইভনিং শো-এ সিনেমা দেখতে বেরোবার আগে পর্যন্ত নিরুপমের মাথায় আসেইনি সে জীবনে এই প্রথম স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে সিনেমা যাচ্ছে। একা একা। মানে দোকা দোকা।

'যেথা এই চৈত্রের শালবন'

'রঞ্জুমাসি আপনি তো লেখেন টেখেন, কত শব্দ ব্যবহার করেন, বলুন তো?'

'কত শব্দ? কেন, বাংলায় যত শব্দ আছে ধরুন সবই ব্যবহার করি।'

একটা বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠে গঙ্গাপ্রসাদের গোলগাল বড়সড় মুখে। বলেন 'বাংলায় তেমন কোনও পরিসংখ্যান নেই। কিন্তু ইংরাজিতে ইয়েস পার্সেন সাহেব বলছেন— সেক্সপিয়রই সবচেয়ে বেশি শব্দ ব্যবহার করেছেন। পঁচিশ হাজার। তার পরে মিল্টন আট হাজার।'

আমি গর্বের সঙ্গে বলি 'সংখ্যা বলতে পারব না। কিন্তু চলিত সব শব্দই তো ব্যবহার করি। ধরুন প্রাতিস্বিক, প্রতিভাস, পরিগ্রাহী।'

'—আচ্ছা বেশ। আপনি "নাড়া" শব্দটা ব্যবহার করেছেন?'

'নাড়া? হ্যাঁ! লেজ নাড়া কথাটা তো আমি প্রায়ই ব্যবহার করি। মাঝে মাঝে ন্যাজ নাড়াও বলি। কনভার্সেশনে অবশ্য, বাড়িতে, লেখাতে ব্যবহার? নিশ্চয়ই করেছি— ভূতের খাট নাড়ানো, গাধার কান নাড়ানো। জানেন আমার হাজব্যান্ড না কান নাড়াতে পারেন।'

গঙ্গাপ্রসাদ তাড়াতাড়ি বলেন, 'ব্যাক্তিগত না, ব্যক্তিগত আনবেন না। আর

"নাড়া" আমি বিশেষ্য হিসেবে বলছি। জীবনানন্দ মনে করুন,...'

'ওহ্, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বলি আঞ্চলিক শব্দ, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বরিশালি, ঢাকাই, ফরিদপুরি, সিলেটি— এ সব ভ্যারাইটি আমার আয়ত্তে নেই। তা যদি বলেন জীবনানন্দের অভীক্ষ্ণও আমি ব্যবহার করিনি। করবও না। ও রকম দুরুচ্চার্য শব্দ ব্যবহার করলে আমার লেখা যে কজন পড়ে, সে কজনও আর পড়বে না। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা টার্গেট অডিয়েন্স তো আছে।' বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে আমি বলে ফেলি।

'আচ্ছা, আচ্ছা আপনার টার্গেট অডিয়েন্স যাই হোক, যারাই হোক, সে প্রসঙ্গে এখন আমি যাচ্ছি না। আপনি কাইন্ডলি আলোচনাটাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করবেন না। আমি যেটা বলতে চাই— আমরা অনেক শব্দ জানি, কিন্তু ব্যবহার করি না। যেমন "পরাজিত"টা বেশি লিখি "পরাভূত"টা অত লিখি না। ধরুন ঠ্যাং, ঠ্যাং কি লেখেন?'

'কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং— লিখে থাকতে পারি'—আমি কবুল করি 'কিন্তু অন্যত্র ঠ্যাং ব্যবহার করতে গেলেই লোকে বলবে জীবনানন্দ থেকে চুরি করেছি।'

'আঃহা, আপনি চুরি চামারির দিকে যাচ্ছেন কেন রঞ্জুমাসি।'

'দেখুন,' আমি রাগতভাবে বলি—'আপনি সমানে আমাকে রঞ্জুমাসি রঞ্জুমাসি করলে আমি এখান থেকে চলে যাব।'

'কী আশ্চর্য! আমি কি সত্যি আপনাকে আমার মাসি বলেছি। আপনি আমার মাসি সম্পর্ক হন না আমি বেশ জানি। তিনুর মাসি তো সেই হিসেবে...'

'আপনি কি কাজলকে "তিনুর মা" বলে ডাকাডাকি করেন? আসল কথা আপনি ভীষণ পুরনো কালের, মধ্যযুগীয় মনোভাবের, সেফ-সাইডে থাকার জন্যে রঞ্জুমাসি রঞ্জুমাসি করছেন।'

'কীসের সেফ সাইড?' গঙ্গাপ্রসাদ অবাক হয়ে বলেন।

'মানে আপনি সমাজকে ভয় পান, একটি মহিলাকে রঞ্জু বা রঞ্জনা বলে ডাকলে যদি কেউ কিছু মনে করে! কেউ আর কে? তীর্ণা খুব মড। কাজলকেই আপনি ভয় পান।'

'কাজলকে আমি একেবারেই ভয় পাই না। কাজলকে আমি পরোয়া করি না। কাজল কী ভাবলো না ভাবল আমার বয়েই গেল। কেন না সেও আমাকে পরোয়া করে না, আমি কী ভাবলুম না ভাবলুম তাতে তারও বয়েই যায়! জানেন এক দিন লোডশেডিং-এর রাতে বাড়ি ফিরে হুলো বেড়ালের আঁচড় খেয়েছিলুম তাতেও সে আসেনি, দিদিমাসির বাড়ি ছিল সারা রাত। জানেন আমাকে ইস্ত্রিতে দুধ গরম করে, ডিমের পোচ করে কাঁচা পাঁউরুটি দিয়ে খেতে হয়েছিল!'

ঘা খেয়ে গঙ্গাপ্রসাদের যাবতীয় অন্তর্নিহিত শিকায়েত বেরিয়ে আসতে

থাকে।

লাল মাটির পথ দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের কথা হচ্ছিল। গ্রীষ্মের ফুলের একটা মৃদু সুবাস সন্ধের হাওয়ায়। ফাদার জেনকিন্‌স বাড়িতে ক্যাসেট চালিয়ে চালিয়ে নিজের উচ্চারণ ঠিক করছেন। তীর্ণা গেছে কোনও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিতে। আমিই গঙ্গাপ্রসাদবাবুকে টেনে বার করেছি। গঙ্গাপ্রসাদ সহজেই রাজি হয়ে গেছেন। কেন না সন্ধেবেলাটুকুও যদি তিনি বাবা জেনকিন্‌সের হাত থেকে রেহাই না পান, তাঁর অবস্থা খুবই সঙ্গীন হবে।

'আচ্ছা ধরুন কাজলের বদলে আর কেউ আপনার বেড়ালের আঁচড়ে মলম লাগিয়ে দিল। আর কেউ আপনাকে ভাল দেখে একটা সায়মাশ রেঁধে দিল।'

'কী বললেন ? সায়মাশ ? ডিনার ? এটা ডিকশনারিতে কাজে লাগাতে হবে। আচ্ছা রঞ্জনাদেবী আপনি তো অনেক শব্দই ব্যবহার করে থাকেন দেখছি। তখন বললেন দুরুচ্চার্য, এখন বলছেন সায়মাশ, নাঃ আপনার হবে, হবে।'

'আমি কিন্তু আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম গঙ্গাপ্রসাদ দেব।'

'দেব তো আমি নই, আমি মিত্তির।'

'আমি রঞ্জনা গড়াই যদি দেবী হতে পারি, আপনি গঙ্গাপ্রসাদ মিত্তির তবে অবশ্যই দেব। না কি আপনার দেবত্বে সন্দেহ প্রকাশ করছেন ?'

এ বার গোল মুখ ভরে খুব হাসলেন গঙ্গাপ্রসাদ।

'দেখুন, মহিলাদের নাম ধরে ডাকা আমার অভ্যাস নেই, এ কথা সত্যি তাতে মধ্যযুগীয় বলেন তো আমি মধ্যযুগীয়।'

'শ্যালিকাকে কী বলেন ?'

'শালী যে আমার নেই ?'

'তবে আমিই আপনার এক জন শালী। স্ত্রীর বন্ধুরা তো শালীই হয়।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব। কী যেন প্রশ্নটা করছিলেন ?'

'আমি আমার প্রশ্নটা আবারও করি, জিজ্ঞেস করি সে ক্ষেত্রে উনি কী করবেন ? অর্থাৎ কেউ যদি ওঁকে আহত বিক্ষত অবস্থায় ফাস্ট এইড দেয়, এবং অসহায় অবস্থায় ভাল করে ডিনার সার্ভ করে তো উনি কী করবেন ?

'এ রকম ঘটার কোনও আশাই নেই মিসেস রঞ্জনা গড়াই। আপনি আমার ছেলে-মেয়েকে চেনেন না। রাত দশটার আগে তারা বাড়ি ফেরে না। পর পর পর পর ডিপ্লোমা নিয়ে যাচ্ছে, কম্পিউটার, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ইনটিরিয়র ডেকোরেশন, গজল, মডার্ন ডান্স, মূকাভিনয়, পার্সন্যালিটি ডেভেলপমেন্ট, ফ্রেঞ্চ, বার্মিজ রেইকি... যেটা লেগে যায়, বুঝলেন না ? ওদের বাড়িতে পাওয়া দুষ্কর।'

'তা হলে ধরুন নেবার্স। প্রতিবেশীরা !'

'প্রতিবেশী ? আপনি হাসালেন মিসেস গড়াই। একমাত্র কলেজের ভর্তির সিজনে এবং টেস্টের ফলাফল বেরুবার সিজনে সেই মহাত্মাদের দেখা পাই।

সেই সময়ে তাঁরা ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, ফলফুলুরি ইত্যাদি নিয়ে টুঁ মারেন। কিন্তু রাত্তির বেলায়, লোডশেডিং-এ, হুলো বেড়ালের বাড়িতে ? নৈব নৈব চ।'

'কিন্তু প্রতিবেশী তো তাকেই বলে গঙ্গাদা, যে নাকি বিপদে সাহায্য করে। যিশু তো তাই বলে গিয়েছেন !'

আমার গঙ্গাদা শুনে গঙ্গাপ্রসাদ ভুঁড়ি পর্যন্ত চমকে উঠলেন। তার পরে সামলেসুমলে বললেন— 'সে রকম প্রতিবেশী নেই আর এ যুগে। নেই।'

'আচ্ছা ধরুন আমি। আমি যদি করি। আমি তো বাড়ি-বসা মানুষ। এটুকু উপকার কারও করতে আমার কোনওই অসুবিধে নেই।'

'আপনি ?'—আমার দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন গঙ্গাপ্রসাদ। দৃষ্টিতে একটা সন্দেহ একটা না বোঝার ভাব।

আমি বলি— 'কী আশ্চর্য ! এই সামান্য ব্যাপারে আপনি এত ভয় খেয়ে যাচ্ছেন কেন ? আপনি অধ্যাপক তারপর ডিকশনারিবাজ, আমি লেখার লাইনের লোক, আমি তো আপনার বাড়িতে নিজের প্রয়োজনেই যেতে পারি। পারি না ? কাজল থাকলে সে আড্ডা দেবে কিংবা শাড়ি দেখাতে শুরু করবে। সুতরাং ; কাজল যেদিন বাড়িতে থাকবে না, সে দিনই আমার যাওয়া ভাল। আর সেই সময়ে যদি বেড়াল বা ইঁদুর আপনাকে আঁচড়ে দেয়, কিংবা আপনার যদি খাবারদাবার না থাকে আমি সে সবের ব্যবস্থা করতে পারি।' শেষ কথাটা অবশ্য আমি খুবই মনমরা হয়ে বললাম।

'কিন্তু লোডশেডিং হলে ?' গঙ্গাপ্রসাদ খুব সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে আড়ে আড়ে চান।

'লোডশেডিং হলে টর্চ আছে, মোমবাতি আছে, সব সময়ে আমার ব্যাগে থাকে। তা ছাড়া লোডশেডিং হলে তো আরও ভাল।'

'কেন ? কেন ?' গঙ্গাপ্রসাদ এত ভয় পেয়েছেন যেন এখুনি হুড়মুড় করে পড়ে যাবেন।

আমি দূরের দিকে তাকিয়ে বলি—

'আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত-রাত্রিটিরে ভাল,
খড়ের চালের পরে শুনিয়াছি মুগ্ধ রাতে ডানার সঞ্চার ;
পুরানো পেঁচার ঘ্রাণ ;—অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো !
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ,— মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক ;...'

গঙ্গাপ্রসাদ যেন নাভির অতল থেকে এক পেলব ব্যারিটোন স্বর টেনে তুললেন। বললেন—

'মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে।
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন শক্ত হয়ে আছে,

নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;'

অনেকক্ষণ চুপচাপ হাঁটলাম আমরা। শালবনের ছায়ার আঁধারে এসে বসলাম। চতুর্দশীর চাঁদ বৈশাখের মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ে নেমেছে। আলো ছায়া ছায়া-ছায়া আলো...এইভাবে আমাদের ওপর দিয়ে প্রকৃতি ভেসে যাচ্ছে।

শেষে গঙ্গাপ্রসাদই বললেন— 'ভালবেসেছি।'

আমি চমকে উঠেছি একেবারে। গঙ্গাপ্রসাদ বললেন— 'এটাকে উনি উল্টে নিলেন হয়ে গেল 'বেসেছি ভাল।' এ বার এই দুটো অংশের মধ্যে উনি পুরো কর্মটাকে ক্রিয়া বিশেষণটাকে কর্তার অংশবিশেষকে ঢুকিয়ে দিলেন— "যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে।' যে লাইনটা তৈরি হল তাই আমাদের মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার গভীর আহ্লাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। বুঝলেন রঞ্জনা!'

'চিল উড়ছে, ওপরে উঠে যাচ্ছে, আরও উপরে, ক্রমশ বিন্দু হয়ে যাচ্ছে কেন বলুন তো ? মেঘের মিনারে সেই ম্যাজিক কেসমেন্ট, সেইখান থেকে ঐন্দ্রজালী ডাক এসে পৌঁছচ্ছে যে।'

আমি বলি— 'নদী আর তীর যেন জল আর আটা। খুব নরম করে দুধে-মাখা, রুমালি রুটির ময়দার মতো মাখা হচ্ছে।'

'কিন্তু গন্ধ, মাখাটা হচ্ছে গন্ধ দিয়ে, জল দিয়ে নয়।'

'অর্থাৎ আরও সূক্ষ্ম, আরও ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ আরও অমোঘ।'

গঙ্গাপ্রসাদ বললেন— 'এবং জ্যোৎস্নার উঠান, ঝিঁঝির শব্দ নয় গন্ধ, প্রান্তরের সবুজ বাতাস, নীলাভ নোনা। রসের জন্যই তো আমাদের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু রস নিজেই আকাঙ্ক্ষায় গাঢ় হয়ে নেমে আসছে। ...জীবনের এই সব নিভৃত কুহক তা হলে আপনি বোঝেন ?'

আমি জবাব দিই না। অন্ধকারটা বড্ডই গাঢ় হয়ে যাচ্ছে। চাঁদ এখন মেঘের আড়াল থেকে বিকিরিত হচ্ছে। জ্যোৎস্নার শালবন। নাকি অন্ধকারের শালবন। একটু একটু ভয় করতে থাকে।

'তা হলে বলি— "আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা
আপনার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে
আমাদের সেই তাহার নামটি...রঞ্জনা।' গঙ্গাপ্রসাদ অপূর্ব বিহ্বল স্বরে বললেন— 'শুনেছেন শম্ভু মিত্র তৃপ্তিমিত্র-র সেই রেডিয়ো নাটক!'

'শুনেছি বই কী', আমি গাঢ় গলায় বলি, 'আর তৃপ্তি মিত্র-র 'খোলো খোলো হে আকাশ স্তব্ধ তব নীল যবনিকা ?" আর শম্ভু মিত্র-র সেই উচ্চারণ গ্যালিলেও বেশে— "হতভাগ্য সেই দেশ। যে দেশের শুধু বীরপুরুষই দরকার হয়!"

শুনেছেন শম্ভু মিত্র-র "ফকির"—আর একটা রেডিয়ো-প্লে। বিভূতিভূষণের রচনা! উহুহুহু অমন হার্ট-রেন্ডিং ভালমানুষির অভিনয় আর শুনব না।'

বলতে বলতেই আমার কানে ভেসে ওঠে ফকিরের সেই আজান ধ্বনি। আসহাদ আল্লাই লাহা' ইল্লাহ...আন্না মুহম্মদ...। রসুলুল্লাহ আল্লা হু আকবর... লা ইল্লাহ লাহ! আমার চোখ দিয়ে টপ করে এক ফোঁটা জল ঝরে পড়ে। 'ব্লেসেড আর দা মীক ফর দেয়ার্স ইজ দা কিংডম অফ হেভন' যিশুর এই বাণীর এমন হৃদয়মন্থী উদাহরণ তো আর নেই! দুজনেই চুপ করে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর বেশ কিছুক্ষণ পর গঙ্গাপ্রসাদ বললেন, দশটা বাজতে আর তেমন দেরি নেই। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। উঠুন রঞ্জনা। শেষকালে জ্বরটর বাধালে আবার তিনু, কাজল, নিরুপমবাবু সবাই আমাকে বকাঝকা করবেন।'

'ফাদারও নিশ্চয়ই আপনার জন্যে উতলা হয়েছেন।' বলেই দুজনে অল্প হেসে উঠি! পরদিনই আমরা প্রিয়া রেস্তোরাঁয় সেখানকার বিখ্যাত পরোটা...আর মাংস খেলুম। বাবা জেনকিন্স আর তীর্থ এক দিকে বসে ছিল। আমি আর গঙ্গাপ্রসাদ এক দিকে।

'এই রকম পরোটা আপনি করতে পারেন ?' খেতে খেতে গঙ্গাপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন।

'আমার রান্না-বান্নার গুণাগুণ আমি শেফালিতে সমর্পণ করেছি।' আমি মৃদু হেসে বলি—

'শেফালি মানে কি শরতের শিউলি ?'

'না, গঙ্গাদা শেফালি আমার কাজের মেয়ে, এই রকম পরোটার দশ ভাগের এক ভাগও আমি করতে পারি না'—আমি অকপটে স্বীকার করি— 'আমি বরঞ্চ দক্ষিণ আমেরিকার ম্যাপ আঁকতে পারব, তার টিকির সঙ্গে উত্তর আমেরিকাকে জুড়ে দিতেও পারব। কিন্তু তিনকোনা পরোটা বেলা আমার দ্বারা হবে না।'

'কেউ বেলে দিলে ?'

'ভাজা ? লেস ডিফিকাল্ট। কিন্তু আমি সেঁকে সেঁকে তাকে শক্ত চামড়া মতো করে ফেলি।'

এ বার গঙ্গাপ্রসাদ সব বদমাইসি ধরে ফেলার হাসি হাসেন।

'বেশি সেঁকলে যে পরোটা চামড়া মতো হয়ে যায় এ তথ্য আপনার জানা আছে, তবু আপনি সেঁকতে থাকেন ? রঞ্জনা, ব্যাপারখানা কী বলুন তো ?' আমি খুবই কাঁচুমাচু হয়ে যাই ধরা পড়ে। সত্যি কথা স্বীকার করাই ভাল। বলি— 'আপনার নিরুপমবাবু খেতে এত ভালবাসেন যে এক বার ভাল রাঁধতে পারলে আর রক্ষা নেই।'

'বুঝলুম। কিন্তু শুনতে পাই যে মেয়েরা উদরের মধ্যে দিয়ে মানে রসনার মাধ্যমে তাদের স্বামীদের হৃদয়ে পৌঁছতে চায়।'

'পৌঁছতে চায় নয় দাদা, বড়ই দুঃখের কথা, এ ভাবেই পৌঁছতে হয়। মানে তারা বাধ্য হয়।'

'আপনি তা হলে এই সাদা-সিধে রুট দিয়ে পৌঁছতে চান না ?' আমি হাসতে থাকি। কে জানত এই নোদল-গোদল ভালমানুষ আপনভোলা বা ব্যোমভোলা অধ্যাপকটির পেটে পেটে এত উইট, এত পর্যবেক্ষণ, এত আবেগ !

গঙ্গাপ্রসাদ বললেন— 'কদিনের কথাবার্তায় যা বুঝলুম আপনি গোলক ধাঁধার পথ একটি হৃদয়ে তৈরি করে রেখেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে রঞ্জনা নিরুপমবাবু কি আদৌ সেই গোলকধাঁধার প্রবেশদ্বারে পা বাড়াচ্ছেন ? খুব ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে প্রশ্নটা তবু জিজ্ঞেস করছি এই সাহসে যে আপনিও শীতের অপরূপ রাতকে ডানা ভাসাবার গভীর আহ্লাদে ভরা বলে চিনতে পারেন। ইচু ফকিরের আজানের শব্দস্মৃতিতে আপনার চোখ দিয়েও জল পড়ে।'

আমি কিছুক্ষণ নীরবে পরোটা চিবোই। মুখের ভেতরটাও গভীর আহ্লাদে ভরে যেতে থাকে। হঠাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় এমন একযোগে আমাকে এত দিতে শুরু করল কেন ভেবে অবাক হই।

তারপর সত্যি কথাই বলি— 'নিরুপমবাবু বা অন্য কেউ গোলকধাঁধার প্রবেশদ্বারটা দেখতে না পেলেও আমার ক্ষতি নেই। মানে ক্ষতি আছে কিন্তু সে ক্ষতিকে পাত্তা না দিতে আমি শিখেছি। কারণ ত্রৈলোক্যনাথ থেকে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়- আবুল বাশার পর্যন্ত গদ্য, রবীন্দ্রনাথ থেকে জয়দেব বসু -নিভা দে পর্যন্ত পদ্য আমায় ভালবাসে। ওই গোলকধাঁধা পার হয়ে যায়। গিয়ে আমার হৃদয়ের কেন্দ্রে কোনও মিনোটর নয়, মেঘের মিনারের জানলার দিকে উড়তে থাকা যে সোনালি চিলনি আছে তারই কাছে পৌঁছে যায়।'

গঙ্গাপ্রসাদের খাওয়া থেমে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ আবিষ্ট দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন— 'এমন প্রতিধ্বনি কোনওদিন শুনতে পেতে পারি আমার কল্পনাতেও ছিল না। কাজলরেখাও সারা জীবন ওই গোলকধাঁধাটাকে উপেক্ষা করে কাটিয়ে দিল। আমারও তাতে কিছু এসে গেল না। কেন এমন হয়, বলুন তো ?'

'সংসারটাকে তো চলতে হবে ! ভিন্নতার মধ্যে দিয়েই সংসারের চলা।'

'হবে বোধ হয়,' গঙ্গাপ্রসাদ ভাবুক গলায় বললেন।

তিন দিন রেস্তোরাঁয় খাওয়া হল। ফাদার জেনকিন্‌স খাওয়ালেন তাঁর নুতুন গার্ল ফ্রেন্ড তীর্ণাকে। আর গঙ্গাপ্রসাদ খাওয়ালেন আমাকে। কিন্তু সিনেমার কথা আমি তাঁকে কিছুতেই বলতে পারলাম না। দু-একটা সিনেমা হল যা হাতের কাছে আছে তাতে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব ছবি হচ্ছে। কী করে বলি ? দেখবই বা কী করে ? তা ছাড়া প্রথম বৈশাখের এই প্রথম আকাশ' এই গন্ধরাজদের ফুটে ওঠা, দোলনচাঁপার মৃদু গন্ধ রাস্তার মাটিটিরে মাখে। কত গাছ, গাছ আর গাছ, আর গাছ। এটাই এমন একটা ছবি যা আমরা রোজ ভোরে শিশির মেখে গঙ্গাফড়িংদের সঙ্গে দেখি, সন্ধেবেলায় দেখি ঘরে ফেরা বিহঙ্গকুলের সঙ্গে। কোনও কোনওদিন তীর্ণা আমাদের সঙ্গে আসে, কোনও

কোনওদিন ফাদার জেনকিন্‌স। আর দিনে-রাতে, সকালে বিকেলে, গ্রীষ্মের গুমোটে কোকিল ডেকে যায়, ডেকে যায়, ডেকে যায়। এত ডাকে যে এক দিন আমার ঈষৎ ভাঙা গলায় আমি —'কোয়েলিয়া গান থামা এবার/ তোর ওই কুহু তান ভাল লাগে না আর'— কত দিনের বিস্মৃত বাণী কোনারের গলায় গাওয়া এই গান অনায়াসে গেয়ে দিই।

তারপর ফিরতি ট্রেন ধরি। আমি আর তীর্ণা।

চন্দনের এক ফোঁটা

অবাক কাণ্ড। দেখি কাজল চন্দন বরাটের গাড়ি করে আমাদের স্টেশনে নিতে এসেছে। বাঁ চোখটা টিপল আমার দিকে চেয়ে। তীর্ণা বলল— 'চন্দনকাকুকে আবার কোথা থেকে জোগাড় করলে।' ঝংকার দিয়ে উঠল কাজল— 'বি.এ. ক্লাসের বন্ধু। একটা উপকার করে দিতে পারবে না ? কত দিন এড়িয়ে থাকবে ? ই-হহ।'

চন্দন বরাট একগাল হেসে বলল— 'তুই-ই তো আমায় এড়িয়ে চলতিস কাজলা। কাজলাদিদি নামটা আমরাই প্রথম তোকে দি, এক দিন বোধ হয় বিপিনবাবুর ক্লাসে কোনও কবিতা থেকে দু লাইন জন্মের মধ্যে কম্ম বলতে পেরেছিলি, সেই থেকেই তোকে দেখে আমরা গাইতুম, "মাগো আমার শোলোকবলা কাজলা দিদি কই।" তুই আর তোর বন্ধু সেই কান্তা না মান্তা ডিজেল এঞ্জিনের মতো ঘস ঘস করে চলে যেতিস।'

'কান মুলে দেব চন্দন মিছে কথা বললে, কাজলা হাত ওঠায়। কান্তা না মান্তা, না ! —ওকে দেখলেই তো তোদের বুক ধড়াস ধড়াস করত। এখন কান্তা না মান্তা ! হুঁ।'

'আরে সেই কান্তা এখন পিসিমা হয়ে গেছে। এক দিন বড়বাজারে দেখা হয়ে গেল। খাঁটি মশলাপাতি, ভাল ঘি সব কিনছে। শস্তায় উল, আপেল, ডেকচি, পিন, কুশন কিছু বাকি নেই। আমি আবার পুরনো প্রেমের কথা স্মরণ করে এক ডজন লেবু কিনে দিই।'

'কী পাতিলেবু ?'— কাজলা শুধোয়।

'আবার কী ! ওতো পাতিলেবুরই খদ্দের এখন। সকালবেলা মধু দিয়ে পাতিলেবুর রস খায় .... তা সে তুলনায় তুই এখন অনেক সরেস আছিস। তোর সঙ্গে একটু-আধটু পরকীয়া করা যায়।'

কাজল এক থাপ্পড় তোলে— 'তুই নিজে পিসেমশাই হয়ে গেছিস কিনা আয়নায় দ্যাখ একবার। তারপর আর কারও সঙ্গে পরকীয়ার কথা ভাবিস।'

তীর্ণা এ বার নাক গলায়— 'চন্দনকাকু, মা তোমরা বাড়ি গিয়ে তোমাদের কলেজি ফষ্টি নষ্টি করো। এখানে ট্রেন-ফ্রেন সব থেমে যাচ্ছে— তা ছাড়া রঞ্জুমাসির খিদে পেয়েছে, শান্ত আর নিরুপমের জন্যে মন কেমন করছে।'

কাজল এ বার আমার সঙ্গে পরিচয় করায়— 'আমার আরেক বন্ধু রঞ্জনা গড়াই। মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের গল্প লেখে, তুই ওর সঙ্গেও পরকীয়া করতে পারিস। ওর নিশ্চয়ই অনেক অভিজ্ঞতা ও বিষয়ে নইলে লেখে কী করে। তা ছাড়া তোদের পদবির বেশ মিল, পদবি কেন ? নামেরও তো !'

চন্দন বলল— 'সে আবার কী ?'

'কেন ? ও রঞ্জনা গড়াই, তুই চন্দন বড়াই।'

আশে-পাশে কিছু লোক মিচকি মিচকি হাসছে। আমি আর তীর্ণা তীরবেগে বেরিয়ে আসতে থাকি ক্যারেজওয়ের দিকে।

'ওইটা রঞ্জুমাসি, ওই নেভি ব্লু এস্টিমটা।'

চন্দন দেখলুম, ওস্তাদ ড্রাইভার। ভিড়-টিড় চমৎকার কাটিয়ে গল্প করতে করতে চলেছে।

'তা রঞ্জনা, আপনার তা হলে দুই পুত্র ?'

'কোথা থেকে জানলেন ?' —তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

'হুঁ হুঁ বাবা, হোমস কি শুধু ইংল্যান্ডেই জন্মায় পোয়ারো কি শুধু বেলজিয়ামেই ? নামও বলে দিতে পারি শান্ত আর নিরুপম।'

তীর্ণা হাঁ- হাঁ করে ওঠে— 'এমা চন্দনকাকু নিরুপম রঞ্জুমাসির হাজব্যান্ডের নাম।'

'তা হলে তুই যে বললি শান্ত, নিরুপম !'

'ও সব আজকালকার ছেলে-মেয়েদের ঢং'— কাজল মন্তব্য করে, 'গুরুজনদের নাম-ফাম ধরে। তা এক হিসেবে তুই ঠিকই বলেছিস, নিরুপম একা কেন, তুই তোরা ... সবাই তো সারাজীবন খোকাবাবুই থেকে যাস।'

'রঞ্জনা প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।'

'না না ঠিক আছে, আপনি নির্ভাবনায় থাকুন। অত সহজে মাইন্ড করলে ...'

'তুই আর রঞ্জনা থাকতিস না, গঞ্জনা হয়ে যেতিস, বল'— কাজল আমার মুখের কথা কেড়ে নিল, 'রঞ্জুও কিন্তু শিল্পীর বন্ধু। রঞ্জুদি বলতে ও অজ্ঞান। আমার বি.এ পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে গেল। রঞ্জু বি.এ পাস করল এম. এ পাস করল, কবিতা লিখল, বুদ্ধদেব বসুর নেটিপেটি হয়ে, গপ্পো লিখল কার নেটিপেটি হয়ে তা জানি না। পরকীয়ার ভাল ক্যানডিডেট।'

চন্দন, স্টিয়ারিং-এ হাত, ঠোঁটে সিগারেট— তারই ফাঁক দিয়ে বলল 'কাজলা তুই তা হলে পথের কাঁটা সরে দাঁড়াচ্ছিস ? ভাল, রঞ্জনা, আপনি রাজি তো ?'

"আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা," সহসা আমার কানের কাছে কে গম্ভীর গলায় বলে ওঠে, আমি কেঁপে উঠি,— তারপর বলি— 'আমি পিসিমা না হলেও মাসিমা হয়ে গেছি যে মি বরাট।'

'ওর উচ্ছ্বাসে জল ঢেলে দিলি যে রে রঞ্জু, তুই তো এমন বেরসিক ছিলি না, ব্যাপার কি বল তো !' —কাজল সন্ধানী চিন্তিত চোখে আমাকে জরিপ করে।

চন্দন বলে 'মাসি আপনি নিশ্চয়ই তীর্ণার, আমার মেয়ে তুলতুলের কিন্তু মাসি-মা আপনি নন।'

'কিন্তু তুই মেসোমশাই' কাজল ঘোষণা করে— 'ইন এভরি সেন্স অফ দা টার্ম।'

'অবজেকশন। রঞ্জনা আপনি বলুন, তীর্ণা তুই বল।'

আমি সন্তর্পণে বলি— 'ইউ আর স্টিল ভেরি হ্যান্ডসম চন্দন ভাই।'

'আর ভুঁড়িটা ? টেনিস বলের মতো ভুঁড়িটা ?' কাজল ককিয়ে ওঠে। গঙ্গাপ্রসাদের পাঞ্জাবির তলায় চাপাপড়া বিস্তৃত ভুঁড়িটা আমার মনে পড়ে, আমি খুব নরমগলায় বলি— 'ভুঁড়িজ রিয়্যালি ডোন্ট ম্যাটার।'

কাজল আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে— 'ভুঁড়িজ ? ভুঁড়িজ ? তুই বহুবচন কেন ব্যবহার করছিস রঞ্জু !'

আমি ক্লান্ত গলায় চোখ বুজে বলি— 'উঃ কাজল আমাকে চিপটে দিচ্ছিস একেবারে। এ বার আগে বাড়ি পৌঁছে দে। চন্দন, কাজলদের বাড়ির আগেই আমার বাড়ির গলি পড়বে, খেয়াল রাখবেন, গলির মুখে নামিয়ে দিলেই হবে।'

'সে কী কথা ! সে কী কথা !' চন্দন চেঁচামেচি করে ওঠে। —'আপনার বাড়ির একেবারে যাকে বলে দোরগোড়ায় নামিয়ে দেব, তারপর আপনি চা কি কফি কি কোল্ড ড্রিংকস খেয়ে যেতে বললে নামব, নইলে নামব না।'

আমি বলি— 'আজ আর নামতে বলব না, কিছু মনে করবেন না। বড্ড ক্লান্ত আজ, কদিন পরে নিশ্চয়ই শুধু কোল্ড কেন ...'

'হট-ও দেবেন বলছেন ?'— কথাটা লুফে নেয় চন্দন।

এভাবেই আমি বাড়ি পৌঁছই।

শেফালির সতর্কীকরণ

দুপুরবেলা চান-টান সেরে, ভাত-টাত খেয়ে একটু শুয়ে পড়েছি, বড্ডই গরম তার ওপরে টেনশন গেছে। ঘর অন্ধকার করে ফ্যান পুরো চালিয়ে দিয়েছি। ওদিকে ঘরের কোণে রেখেছি এক বালতি বরফঠাণ্ডা জল। আমি গরিব মানুষ। আমার বাড়িতে এয়ার-কন্ডিশনার নেই। গ্রীষ্মের দেশে জন্মেছি, গ্রীষ্মের দেশেই মরব। তা ছাড়া ত্বকের ওপর গরম রোদের ঝলসানি, গুমোট গরমে ভাপে সেদ্ধ হওয়ার এই সব যদি না অনুভব করি তা হলে লিখব কী করে ? গ্রীষ্মকে বর্ষাকে যে রবীন্দ্রনাথের মতো ভালবাসতে পারলুম না— এ তো আমারই অক্ষমতা। এ অক্ষমতার জন্য আমি লজ্জিত। আর একটা সুবিধে আছে, আমাদের এ বাড়ি পুরনো দিনের। কুড়ি ইঞ্চি গাঁথনির দেওয়াল, সিলিংও যথেষ্ট উঁচু। ওপরে ছাত আছে। রোদে খাক হচ্ছে, তাই তার তাত নীচে খানিকটা নামেই। নইলে আমার বাড়ি আধুনিক সব মানুষের খোপ ফ্ল্যাটবাড়ির চেয়ে অনেক কম গরম।

ঘুমটা এসে যাব এসে যাব করছে, শেফালিবাবু ঢুকলেন। শেফালির একটা অসামান্য প্রতিভা আছে। ও ঠিক বুঝতে পারে ঠিক কখন আমি ঘুমের কোলে ঢলব ঢলব করছি, বা কখন আমার মনোযোগ চূড়ান্ত। আবার হাত চলছে, মন চলছে, কোথায় আছি, কেন আছি খেয়াল নেই। ঠিক সেই সময়েই ও খ্যানখ্যান করে একটা কাঁসি বাজিয়ে দেবে। খ্যান খ্যান খ্যান খ্যান।

'কী হলরে ? কী হল ?'

'মারো বউদি আমায় মারো'— বলতে বলতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে শেফালি এসে উপস্থিত হল।

'হলটা কী ?'

'সবচেয়ে ওপরের তাক থেকে অবরে-সবরে বার করার কাঁসার পরাতখানা পড়ে গেল।'

'গেছে ?'

'কানা ভেঙে গেছে।'

'বাঃ ! নিজে থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল পরাতটা ? আত্মহত্যা করল না কি ? তুই কি কোনও সাহায্যই করিসনি ?'

'পাশ থেকে খন্তি দিয়ে কুরুনিটা পাড়তে গিয়েছিলুম।'

'বা বা বা, এখন যাও।'

কাঁসা পেতলের কিছু বাসন আমাদের এখনও আছে। কাঁসার জামবাটি, কাঁসার পরাত, চোদ্দো পনেরো জনের ময়দা মাখা যায় তাতে, নতুন কাঁসার সেট তো আছেই। জনা ছয়েককে পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খেতে দেওয়ার মতো। স্টেনলেস স্টিলের ব্যক্তিত্বহীন সামান্যতার সাম্রাজ্যে পুরনো দিনের ঝকঝকে কাঁসা পেতল। আর কিছু না হোক সাজিয়ে রেখে দিলেও ভাল লাগে। সেই কাঁসার পরাত শেফালিবাবু ভাঙলেন। ভাঙলেন আবার মোক্ষম সময়ে, যখন আমার লেখা জমে উঠেছে। ভেঙে আবার নাটক করছেন— 'মারো বউদি, আমায় মারো।' মারতেই ইচ্ছে করছে। বেধড়ক মার। কিন্তু মারতে আমরা কবেই ভুলে গেছি। 'এখন যাও' আর 'বা বা বা' ছাড়া আর কী-ই বা বলতে পারি ! মন মেজাজ তিতকুটে হয়ে যায়। লেখা ছেড়ে, টেবিল ছেড়ে, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকি কিছুক্ষণ। পৃথিবীতে সব বস্তুই নশ্বর, ভঙ্গুর, যা গেছে তা গেছে, মন খারাপ করে বোকারাই— ইত্যাদি বাক্যে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করি।

ঘুমের জন্য শুলে আমার চোখ ছোট বাচ্চাদের মতো এক বার খোলে, আবার বন্ধ হয়ে যায়। আবার খোলে, আবার বন্ধ হয়, ফট করে আবার খুলে যায়— দেখি ঘরের আধো অন্ধকারে পায়ের দিকে শেফালিবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঁচল আঙুলে জড়াচ্ছেন। অর্থাৎ কিছু বলবেন। বলুন তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু ঠিক এই সময়টাই বেছে নিতে হবে ? আবার বিনীত ভঙ্গিটা দেখো, যেন কৃষ্ণের শয্যার পায়ের দিকে অর্জুন। ওই অর্জুনের মতোই ধুরন্ধর।

'কিছু বলবে ?'

'অ্যাল'— করে জিভ কাটে শেফালি— 'তোমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলুম তো !'

ভাঙা আর ভাঙানো এই দুটিই তো ওর প্রধান কাজ। যাক গে সে কথা বলে আর কথা বাড়াতে চাই না।

'বলে ফ্যালো তবে'— অনুমতি দিই।

'রাগ করবে না তো ?'— শেফালির অনুনয়।

'রাগ করার মতো হলে করব বই কি ?'

'রাগ করার মতোই বউদি। কিন্তু আমি শুধু খপর দিচ্ছি। আমার ওপর রাগ-ঝাল করো না।'

রহস্য গাঢ়তর। ব্যাপার কী ?

'শিল্পীদিদি বড্ড বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।'

'মানে ?'

'মানে আর কী বলব। তুমিও শান্তিনিকেতন গেলে আর শিল্পীদিদিও জমিয়ে এসে বসল।'

'এখানেই ছিল না কি কদিন ?'

'ছিল নাকো। কিন্তু রোজ আসত প্রায় রোজ। আজ দই বড়া করে আনছে। কাল রোগন জুস, পরশু ফিশ তন্দুরি। দাদাবাবু এলে দেখো, চেহারা অনেক ফিরেছে। শান্ত তো লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফেরে। শিল্পীমাসি আজ কী এনেছো ?'

'তা শিল্পীমাসিই খালি এক তরফা খাইয়ে গেল ? তোমরা কিছু খাওয়ালে না তাকে ?'

'কী সব্বোনাশ, খাওয়াব কি গো, আমি তো ভয়ে আধখানা, পোড়-খাওয়া মেয়েমানুষ বাবা, আমার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না। দাদাবাবু খুব পটেছে। দু-দিন সিনেমা গেছে। এক দিন দর্পণায়—যুগান্ত, আর এক দিন নন্দনে কী জানি কী চেক ফিলম। ফিলিমও যে চেক-কাটা হয় এই প্রথম শুনলুম বউদি। আর খাওয়ানোর কথা বলছ, —আমার আর দরকার কি ? সে কর্তব্য দাদাবাবুই করেছে। তিন দিন মোট তিন দিন, বাইরে থেকে খেয়ে এল। শান্তর জন্যেও এনেছিল। আমার জন্যেও। কিন্তু সে সব আমরা খাইনি। চুপিচুপি ফেলে দিয়েছি।'

'সে কী ?' কেন ?'

'যদি তুকতাক থাকে বউদি ?'

'বা ! বা ! বা ! এখন যাও।'

এ ছাড়া আর কী-ই বা বলতে পারি আমি, কোথায় কোথায় খেল কে জানে। শিল্পীর ভীষণ নাক-উঁচু, যেখানে-সেখানে ঢুকবেই না। ভাল-ভাল খাদ্যগুলো শান্ত বেচারি খেতে পেল না।

'তুমি ছেড়ে দিতে পারো বউদি। তুমি দেবী। আমি কিন্তু ছাড়ব না। আমি ঘরপোড়া গোরু। তোমার ঘর আমি পুড়োতে দেব না। আংরা জ্বেলে ওই খ্যাংরাকাঠির মুখে যদি আমি নুড়ো না জ্বেলেছি তো ...'

'যাবি ? একদম বাজে বকবি না।'

ফুঁসতে ফুঁসতে শেফালি চলে গেল।

এত বিরক্তি সত্ত্বেও আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। তবে ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুম। তার মধ্যে স্বপ্ন— একদম সত্যির মতো। একটা বিরাট লাইব্রেরি। ফাদার জেনকিন্স এক দিকে বসে লেখাপড়া করছেন। আমাকে আঙুলের ইশারায় ডাকলেন। তারপর একটার পর একটা প্রশ্ন করতে লাগলেন। একটারও আমি উত্তর দিতে পারছি না। লজ্জায় মাথা নিচু করে আছি। কয়েকটা প্রশ্ন পর্যন্ত মনে আছে। ললি পপ-এর বাংলা কী ? গঙ্গা আর হিমালয় ছাড়া ভারতে আর কী বড় নদী আছে ? ই ইকোয়ালস্ এম সি স্কোয়্যার যদি হয় তা হলে নিরুপম ইকোয়ালস শিল্পী স্কোয়্যার হবে না কেন ? আরও অনেক প্রশ্ন ছিল, কোনওটারই উত্তর দিতে পারিনি। হঠাৎ ঘুমের ঘোরটা একটু কেটে যেতেই চুষি ল্যাবেঞ্চুস, চুষি ল্যাবেঞ্চুস বলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

একটা মুখ আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

'কে ?' বলে এক প্রচণ্ড ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়েছি। 'বা বা গো' বলে কে যেন ঘুরে পড়ল।

ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি কোণের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিরুপম বসে আছে।

বললে— 'বোলপুরের জলমাটিতে রণচণ্ডী হবার এলিমেন্ট আছে জানতুম না। উফ্‌ফ !'

'ঘুমোচ্ছি, ও রকম করে মুখের ওপর ঝোঁকে। ঘুমের ঘোরে ঘাবড়ে যাব না ?'

'ল্যাবেঞ্চুস ল্যাবেঞ্চুস বলে বিড়বিড় করছিলে কেন ? স্বপ্নে কি ছেলেবেলায় ফিরে গিয়েছিলে ?'

'আমি পড়া পারছিলুম না।'

'তার ঝাল আমার ওপর ঝাড়লে ? বেশ করেছ, এখন স্বপ্নের পাঠশালা থেকে উঠে এসে আমার মাথায় বরফ দাও।'

মাথার পেছন দিকে একটি ছোট্ট ট্যাঁপারি মতো হয়েছে। ছি, ছি। যদি বেচারার মাথা ফেটে যেত। তাড়াতাড়ি বরফ আনতে যাই। বরফ বার করে একটা প্লাস্টিকের মগে ভরছি। শেফালিবাবু চুলে এলোখোঁপা বাঁধতে বাঁধতে এলেন।

'কী হল বউদি ? হঠাৎ...'

বললুম— 'দাদার মাথায় লেগে গেছে।'

চলে যাচ্ছি, পেছন থেকে চাপা গলায় বলছে শুনি, 'বেশ করেছ। উচিত

শিক্ষে দিয়েছ। বিষ ঝেড়ে না দিলে...'

'চুপ করবি ?'—আমি জিভে বিষ ঢেলে বলি। কিন্তু মনের মধ্যেটা কেমন খচখচ করে। এমন করছে কেন শেফালি ? এতটা ?

একটু পরেই শান্ত ফিরল। চোদ্দো বছরের অশান্ত ছেলে। আমাকে দেখে 'ইয়া, ইয়াও' বলে কয়েকটা লাফ দিয়ে নিল। তার বাবা তখনও মাথায় হাত বুলোচ্ছে, চুল সব ভিজে।

ছেলে বলল— 'ও কী বাবা ? চুল দিয়ে জল ঝরছে কেন ?'

'তোমার মাতৃদেবী মেরেছেন বাবা, এমন মেরেছেন যে শীতের নতুন আলু বেরিয়ে গেছে, তাই বরফ দিতে হয়েছিল।'

—'আহ ? ইয়ার্কি মেরো না'— আমি খুব রাগ করি।

শান্ত বলে 'তাই বলো, আমি ভাবলুম মা বুঝি সত্যি সত্যি মেরেছে— শিল্পীমাসির সঙ্গে সিনেমা গেছো বলে।' —শেষের অংশটা ও চাপা গলায় বলল।

আমি প্রচণ্ড রেগে যাই— 'শান্ত !'

শান্ত নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে স্পিকটি-নট হয়ে দাঁড়ায়।

'কখনও আমাকে মারামারি করতে দেখেছ ?'

'না।'

'তা হলে ? এ রকম অসভ্যের মতো কথা বলবে না !'

আমি আড়চোখে নিরুপমের দিকে তাকাতেই আড় চোখাচোখি হয়ে গেল। অর্থাৎ নিরুপমও সেই মুহূর্তে আমার দিকে আড়চোখে চেয়েছিল।

আমি বললাম, 'দুপুরে আমাকে চন্দন পৌঁছে দিয়ে গেল।'

'চন্দন কে ?'

'সে কী ? শিল্পীর বরকে চেনো না ? চন্দন বরাট। গাড়ি নিয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিল। নেভি ব্লু মারুতি এসটীম !'

'শিল্পী ছিল ?'

'না, শিল্পী কোথায় ?' তীর্ণা যে ছিল, কাজলরাও যে ছিল আমি ভাঙি না।

'হঠাৎ চন্দন বরাট তোমাকে স্টেশন থেকে আনতে যায় কেন, জানি না বাবা।' নিরুপম নিজস্ব মেজাজ খারাপের স্টাইলে বলে।

'তুমি যাও না বলে,' শান্ত খুব সরল মুখে বলে।

আমি ওকে আদর করে বলি— 'লাখ কথার এক কথা বলেছিস।' ও লাফাতে লাফাতে চলে যায়, 'ইয়া, ইয়াও।'

আমি বলি— 'বাজার করব একা একা, প্রকাশকের বাড়ি যাব একা একা, বেড়াতে যাব একা একা, লোক-লৌকিকতা করব একা একা, কী ? না নিরুপমদা ওয়ার্ল্ডের হিরো, তাঁকে নইলে এক মুহূর্ত চলে না, নিরুপম গড়াই পলিটিক্স করছেন, কই অন্য কারও বেলায় তো সময়ের অভাব হয় না।'

'নিজের বউকে বলা যায়, অপরের বউকে কি যাব না বলা যায় ? যা নেই

আঁকড়া তোমার বন্ধু। নিরুপমদা 'যুগান্ত' চলুন, নিরুপমদা অমুক চলুন তমুক চলুন...' পাগল করে দিয়েছে একেবারে।'

আমি বললুম, 'আর নিরুমপদা দই বড়া খান, নিরুপমদা শাম্মী কাবাব খান, এগুলো তো বলছ না!'

'তুমি কী করে জানলে?'

'জানলাম।'

'শেফালিবাবুর লাগানো-ভাঙানো তা হলে হয়ে গেছে? ওকে কি স্পাই রেখে গিয়েছিলে? এত দূর সাহস ওর, যে আমার ওপর টিকটিকিগিরি করে তোমাকে লাগায়?'

আমি বললুম, 'সে আবার কী— শিল্পীদিদি ভাল-ভাল খাবার-দাবার করে তোমাদের খাইয়ে গেছে, এটা বললে লাগানো হয়? বলবে না? এটা যদি না বলার মতো কোনও গর্হিত ব্যাপার হয় তা হলে তুমি ওকে সেটা বলে দিলেই পারতে।'

নিরুপম রণে ভঙ্গ দেয়।

শিল্পী

শিল্পী কাজলের বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলে— 'বাব্বা; একটা ফেজ গেল। চন্নন গেছে?'

'অনেকক্ষণ।'

'তবু ভাল।'

শিল্পী সেইরকম মেয়ে যাদের দেখে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একটা আর্টিকল লিখেছিলেন— 'দোহাই তোদের একটুকু মোটা হ।' চেহারার খানিকটা মিলের জন্যে সে সচেতনভাবে ভূতপূর্ব বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেনের মতো সাজে। মাঝখানে সিঁথি কেটে চকচকে পাট করে চুল আঁচড়ানো।

আজ সে জিনস-শার্ট হাঁকিয়ে এসেছে। মাঝখানে সিঁথি কেটে চকচকে পাট করে চুল আঁচড়ানো। কাজল বললে, 'কী রে আজ যে একেবারে কোমর বেঁধে ব্যাপার কী?'

'আজ কোমর বেঁধে? বলছ কি কাজলদি? লাস্ট মান্থটাই তো কোমর বেঁধে ছিলুম। আজ রঞ্জুদি এসে গেল আমারও ডিউটি শেষ।'

'কম্ম ফতে?'

'ফতে বললে ফতে। ফতে নয় বললে নয়।'

'বুঝিয়ে বল।'

'আগে ঠাণ্ডা নিয়ে এসো। দিল কী আজাদি ভাল করে অনুভব করি', শিল্পী সোফার ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল। একটা পা সোফার হাতায় তুলে দিয়ে।

ঠাণ্ডা নিয়ে এসে কাজল বলল— 'কী রে সোফার ওপর ঠ্যাং নাচাচ্ছিস কেন, এ পোজে তো সুস্মিতা সেনের কোনও অ্যাড দেখিনি।'

'দ্যাখো কাজলদি, বেশি বাজে বকো না, আমি এখন ভীষণ টায়ার্ড। জানো কত রেঁধেছি? মাটন রেজালা, বিরিয়ানি, শাম্মি কাবাব, চিকেন উইথ ক্যাশু নাটস, ফিশ বলস, ল্যাম উইথ ডাম্পলিংস, স্মোকড হিলসা, পাইন অ্যাপল হিলসা...'

'উঃ থাম থাম' কাজল কানে আঙুল দেয় 'এ বার বোধ হয় বলবি মাটন ইন রাবড়ি।'

'বলতেই পারি। তোমাদের জামাইষষ্ঠীতে কী হয় মেনু? আগে মাছের ফ্রাই, ইলিশের ভাপা, মটন কারি এবং শেষ পাতে ল্যাংড়া আম আর রাবড়ি। অনেক জামাই-ই এই খেয়ে পটল তুলেছে তা জানো! বাঙালিদের মতন আনসায়েন্টিফিক মেনু আর কোনও জাত করে না। বিদেশে ওয়াইন পর্যন্ত এক এক রকমের মেনুর সঙ্গে এক এক রকম। হোয়াইট ওয়াইন খাবে মাছের সঙ্গে চিকেনের সঙ্গে, রেড ওয়াইন খাবে মাংসের সঙ্গে। খাবার আগে খাবে ককটেইল, পরে খাবে লিকিঅর। আহ্, কফি ব্র্যান্ডি কি আইরিশ ক্রিম যা খেতে না!'

'ওহ্ শিল্পী, তোর বর বিদেশ যায় তুই বিদেশ যাস। আমি জানি। বাজে কথা রাখ। ফতে অথচ ফতে নয় কেন বললি— বাতা।'

প্যান্টের পকেট থেকে তিন জোড়া সিনেমার টিকিট বার করল শিল্পী, ব্যাগ খুলে বার করল তিনটে রেস্তোঁরার বিল। সবগুলোতে সই করা। নিরুপম গড়াই। এন. গড়াই, এন. গড়াই।

'সইগুলো কী করে বাগালি?'

'বললুম— অটোগ্রাফ করে দিন তো মশাই। অদূর ভবিষ্যতে তো মন্ত্রী হচ্ছেনই। তখন এগুলো নিলামে তুলে কিছু পয়সা কামাব।'

'অমনি দিয়ে দিল?'

'দিল তো!'

'বেহেড বোকা নিরুপমটা। তখনই বলেছিলুম রঞ্জুটাকে, পার্টি করে, ও ছেলেকে বিয়ে করিসনি। ও টুপি পরবার জন্যেই জন্মেছে। তো শুনল না।'

'তারপর?'

'তার আর পর কী? স্থির হয়েছিল তিনটে রেস্তোঁরা একটা সিনেমা। আমি দুটোই তিন তিন প্রমাণ সহ এনে ফেলে দিলুম তোমার কাছে। তুমি রেকর্ড রাখো, ফাইল করো। বহোৎ কস্ট কী! কত নাটক, কত ঘোরাঘুরি, খরচাপাতিও মন্দ হল না।'

'খরচাপাতি তোর হবে কেন? ও তো ওই বোকাটার।'

'আরে সব সিনেমা, সব রেস্তোঁরা কি প্ল্যান করে ঢোকা যায়। নন্দনে সিনেমা দেখে বললুম— চলুন না নিরুপমদা তাজবেঙ্গলে খাই আজ। তো তো

করতে লাগল। নানান বায়নাক্কা। ছেলে নেই, বউ নেই। সবাই মিলে এক দিন আসা যাবে, আজ কোথাও একটু কফি আর স্ন্যাকস খেয়ে বাড়ি যাওয়া যাক। ছেলে নেই, বউ নেই ও সব ছুতো, আসল কথা রেস্ত নেই। আমি বললুম, "আপনাকে আজ আমি খাওয়াবই। শান্তর জন্য নিয়ে যাব। আপনি আমাকে দু দিন খাওয়ালেন। আমি এক দিন।" তখনও বলছে খাঁটি কমিউনিস্টদের তাজবেঙ্গলে যাওয়া মানায় না। আমি বললুম, 'বা রে, যখন মন্ত্রী হবেন, তখন এড়াবেন কী করে ? তখন তাজবেঙ্গল, শেরাটন গ্রুপ... শিল্পী বলে একটা আবদেরে শালী ছিল মনেই পড়বে না।'

'এতেই হয়ে গেল ?'

'গেল তো !'

'ইডিয়ট।' কাজল বলল।

'ইডিয়ট হতে পারে, কিন্তু ভীষণ শেয়ানা।'

'কীরকম ?'

'লোকের চোখের সামনে দিয়ে বেরোবে। কত সাধাসাধি করলুম একটা ভেনু ঠিক করতে সেখানে মিট করব, পাত্তাই দিল না। সেই আমাকে রোজ রোজ শাড়ি কিংবা শালোয়ার কামিজ পরে যাদু ঘোষের স্ট্রিটে যেতে হবে। ওই রাস্তায় তো আবার মেয়েদের প্যান্ট পরে ঢোকা নিষিদ্ধ।'

'লেখা আছে না কি ?'

'ও সব বোঝা যায় কাজলদি ?'

'মানে তোর এই দুর্ধর্ষ রূপটা বোকাটাকে দেখাতে পারলি না, এই তো !'

'দেখিয়েও বোধ হয় কিছু হত না। তোমাদের উত্তর কলকাতা হোপলেসলি মিডিইভ্যাল। নিরুপমদার মত মেয়েদের শাড়িতেই সবচেয়ে ভাল দেখায়, রান্না জানা মাস্ট, সাজগোজের দিকে বেশি নজর দেওয়া এই গরিব দেশে নাকি মানায় না।'

'সারাটা মাস তুই ওই বোকাটার মনোহরণ করবার জন্যে যোগিনী সেজে রইলি ?'

'ভারী বয়ে গেছে। মনোহরণ আবার কী ?' শিল্পী ঠোঁট উলটাল। পেটের কথা বুঝতে অতশত লাগে না। জিনসটাই শুধু পরিনি। ম্যাচিং লিপস্টিক, ম্যাচিং টিপ, কস্ট্যুম জুয়েলারি, ভাল ভাল শিফন, খুব সেজেছি।'

'তাতে কী রি-অ্যাকশন ?'

ফুঁসে উঠে শিল্পী বলে 'রি-অ্যাকশন ? আহেলিতে খেতে গেছি, বললে 'আমি এত দিন তোমাকে আপনি বলছিলাম, সরি।'

'তারপর ? তারপর ?' কাজল উৎসাহে মুখে এক টিপ মৌরি ফেলে।

'তার আর পর নেই'— শিল্পী বললে।

'কী বলাবলি করলি বলবি তো' 'আমি বললুম, 'আপনাকে তো কবেই তুমি বলবার অধিকার দিয়ে রেখেছি, "হ্যাঁ", নিরুপমদা বললে—"আমি প্রথমটায়

বুঝতে পারিনি তুমি এত ছোট মানে বাচ্চা।"

'তো ভাল তো ?' কাজলের উৎসাহে একটুও ভাঁটা পড়েনি। 'বাচ্চা মেয়েই ওরা ভালবাসে। নিজেরা যত ধেড়ে হবে তত বাচ্চা পছন্দ ওদের।'

শিল্পী খুব মুষড়ে গেছে, বলল— 'কাজলদি, অত মনস্তত্ত্ব জানি না, নিরুপমদা আমার প্রেসটিজ একেবারে পাংচার করে দিয়েছে।'

'তো ভাল তো'— অভ্যাশবশত বলে ফেলেই, কাজল নিজেকে সংশোধন করে 'না, প্রেসটিজটা কীভাবে পাংচার করল না জেনে...'

শিল্পী বলল— 'তোমাকে বলেই বলছি। ভেঙো না কারও কাছে। বলে— তোমাকে বেশ ইয়াং আর লাইভলি দেখে আশা হয়েছিল— মার্কসিজম যে এখনও প্রাসঙ্গিক, তার ঠিকঠাক প্রয়োগ যে এখনও কুত্রাপি হয়নি— এটা বোঝাতে পারব, কিন্তু তুমি এতই শিশু, বলছ পল সায়েন্সে হনস্ নিয়ে পাশ করেছ, টুকে পাশ করোনি তো ?'

'বলল ? এই কথা বলল তোকে ? তুই মেনে নিলি ? ঝগড়া করলি না ?'

'করব না ? একশো বার করেছি। শুনিয়ে দিলাম— ব্রেবোর্নের মেয়েরা টুকলির সুযোগ পায় এ কথা যদি মনে করে থাকেন, ভুল করবেন। দিদিদের পরীক্ষার সময়ে যমের মতন চেহারা হয়ে যায়। আর তা যদি বলেন, সারা বছর ইউনিয়ন করে ইউনিয়নের চাঁইরা কী করে ফার্স্ট ক্লাস পায়, কী করে অ্যাট অল পাশ করে আমি জানতে চাই।'

'কী এক্সপ্লানেশন দিল তাতে ?'

বলল— 'সেই জন্যেই তো কোনওমতে পাশ করেছি। নইলে রঞ্জুকে দেখিয়ে দিতুম। আর রিয়্যাল কম্যুনিস্টরা কখনও পরীক্ষকদের সঙ্গে লাইন করবে না। ও সব বুর্জোয়ারা করে। তোমাদের মতন আর কী !'

'তারপর ?'

'তার আবার পর থাকে ?' গটগট করে বেরিয়ে চলে এসেছি। আসবার সময়ে বলে এসেছি 'এই অপমানের একটা বিহিত আমি করবই। রঞ্জুদিকে বলবো আপনি ডুবে ডুবে জল খান। আমার মেয়ে তুলতুলকে কক্ষনও আপনাদের বাড়িতে রাখব না। তাকে আপনি ব্রেন-ওয়াশ করে ডাই-হার্ড কমিউনিস্ট করে ছেড়ে দেবেন, আমার এত ড্রেসের কালেকশন, এত কস্ট্যুম জুয়েলারি, আসল জুয়েলারি সব মাঠে মারা যাবে। বরং শান্তকে আমি হোস্টেলে রাখবার ব্যবস্থা করছি।'

'কী বলল ?'

'কী আবার বলবে ?' ..."আরে আরে চটছ কেন ? শান্তকে হোস্টেলে রাখলে যে রঞ্জুদির সাহিত্যের উৎস শুকিয়ে যাবে। তুলতুলের জন্যে চকলেট কিনেছি, নিয়ে যাও, চন্দনবাবুর জন্যেও একটা কিনেছি... বাচ্চা মেয়ের বাচ্চা বর।'

শিল্পীর চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

কাজল বলল, 'তুই একটু কেঁদে নে। আমি আসছি।'

আসল কথা কাজলের খুব হাসি পেয়েছে। শোবার ঘরে হাসতে গিয়ে দেখল তীর্ণা আধশোয়া হয়ে বই পড়ছে। অনীকের ঘরে হাসতে গিয়ে দেখল একটা আরশুলা ঘুরছে, গঙ্গাপ্রসাদের পড়ার ঘরে ডাঁই করা বই, দেওয়ালের তাকে, খাটে চেয়ারে-টেবিলে, বসবার জায়গাই নেই, তার হাসবার জায়গা! কাজল অবশেষে বাথরুমে গিয়ে পেট খুলে হাসল।

মুখে চোখে জল থাবড়ে যখন বসার ঘরে গেল, দেখে শিল্পী সোজা হয়ে বসে কাগজ পড়ছে। টেলিগ্রাফ, স্টেটসম্যান, এশিয়ান এজ, গণশক্তি, আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান— সব।

কাজল বলল, 'কী রে ? পলিটিক্সে জ্ঞান সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছিস ?'

'পা—গল !' শিল্পী বলল— 'কাগজ থেকে পলিটিকসের জ্ঞান সংগ্রহ হয় ? কটা সুইসাইড, কটা ধর্ষণ, কটা মার্ডার, কটা গণপিটুনি তার একটা স্ট্যাটিসটিক্স নিচ্ছিলুম।'

'আর হাওয়ালা ! স্ক্যাম ?'

'ওর হিসেব নেওয়া ছেড়ে দিয়েছি। তা তোমাদের বাড়ি এত্ত কাগজ কাজলদি !'

কাজল বলল— 'কী করি বল— আমি "আনন্দবাজার" ছাড়া পড়ি না, আমার বর "স্টেটসম্যান" ছাড়া পড়ে না, আমার ছেলে পড়ে "টেলিগ্রাফ" আর "আজকাল" ব্যালান্স করে, মেয়েটার চাই "বর্তমান"। "এশিয়ান এজ"টা শন্তায় পাই, আর "গণশক্তি"টা ছেলেমেয়ের এক বন্ধু আছে গোপাল, সে গছায়। আমরা যে যার বিল দিই ভাই, স্বামী-বাবাকে ট্যাক্স করি না।'

'স্বামী-বাবা কে ?'

'কে আবার ? আমাদের হোটেল-মালিক। আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়েদের বাবা।'

'উঃ, পারোও বাবা, কাজলদি। আমি ভাবলাম তোমাদের গুরু-টুরু কেউ হবেন। আজকাল সব ঘরে ঘরে গুরু হয়েছে।'

'হ্যাঁ, এককালে ঘরে ঘরে গোরু থাকত, এখন তাতে একটা করে হ্রস্ব উকার যোগ হয়েছে, যুগ বদলালে যোগ তো হবেই।'

'কিন্তু কাজলদি, গুরু আগেও ছিল, আমার মামার বাড়ি, মাসির বাড়ি, সব আগের জেনারেশন গুরুদীক্ষা নিয়েছিলেন।'

'ঠিকই বলেছিস। তবে আগে গোরুটাও ছিল, এখন সেটা আর থাকছে না, এখন মাতৃদুগ্ধ খেতে হবে বড় হয়ে গেলেও, বুড়ো হয়ে গেলেও, কিংবা হরিণের দুধ। গোরুর দুধ আর এরা খেতে দেবে না।'

এবার শিল্পী আসল প্রসঙ্গে আসে।

'চন্দনকে স্টাডি করবার জন্যে তুমি আর কদ্দিন সময় নেবে ? গাড়ি ছাড়া আমার কিন্তু খুব অসুবিধে হচ্ছে কাজলদি।'

'বেশ তো চন্দনকে বলে দিচ্ছি, গাড়িটা তোকে দিয়ে দিতে।'

'বাপ রে, এত দূর !'

'এতই দূর।' বলে কাজল আর এক টিপ ভাজা মৌরি মুখে পোরে।

আর এক ফোঁটা চন্দন

তা যদি বলো, কাজলের সঙ্গে তার ভূতপূর্ব সহপাঠী চন্দন বরাটের দেখা হয়ে যাওয়াটা একদম কাকতালীয়। 'জীবনদীপ' থেকে বেরিয়ে তার নেভি ব্লু এসটীম নিয়ে দক্ষিণের দিকে বাঁক নিয়েছে চন্দন— এমব্যাসি হোটেলের সামনে দেখে ট্যাকসি ট্যাকসি করে আলুথালু হয়ে চেঁচাচ্ছে, এক খুনখারাপি লাল মহিলা, ব্যাকগ্রাউন্ড কালো। কেমন চেনা-চেনা। কাজলরেখা না ?

হুশ করে গাড়ি থামিয়ে চন্দন মুখ বাড়ায়, 'কাজলীদিদি না ? কোথায় যাচ্ছিলেন, মানে যেতে চাইছিলেন ?'

'দক্ষিণাপণ।'

'আরে আমি তো ওদিকেই যাব। উঠে আসুন, উঠে আয়।'

উঠতে-উঠতে কাজল বলে— 'এ যে দেখি কনেচন্দন ? তা উঠে আসুন উঠে আয়টা, কী ব্যাপার ?'

'যেটা অ্যাকসেপ্টেড হয়, তোমাকে চয়েস দিলুম ভাই। এক সময়ে কলেজ সুদ্ধু ছ্যামড়া তোমার পেছনে লাগতুম, সেই দুঃখে তুমি নাকি আট দশ বছরের বড় এক মাস্টারমশাইয়ের গলায় মালা দিলে, কী তোমার অবস্থা, তুই-ফুই আর চলবে কি না— বোঝা তো যাচ্ছে না। আফট্রল গঙ্গাপ্রসাদ মাস্টারমশাইয়ের গঙ্গাপ্রসাদনী তো তুমি। গুরুপত্নীকে তুই বলা... ওহ্ কত দিন পর দেখা কাজল— !' চন্দন আন্তরিকভাবে খুশি হয়ে বলে, 'চল তোর দক্ষিণাপণ একটু পরে যাবি— আজ একটু চা খাওয়া যাক।'

মেঘ না চাইতেই জল ! কাজলের মনটা ফুর্তিতে ডগোমগো। অন্যরা এখন স্ট্রাটেজি খুঁজছে—আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে বলে গলা ফাটিয়ে ফেলছে, আর তার কেস ? জলবৎ তরলং। খুনখারাপি লালের ওপর মেডন হেয়ার ফার্নের মতো সরু সরু কালো কালো চেকের শাড়িটা সে ইচ্ছে করে পরেছিল, যাতে তার রঙের সঙ্গে কনট্রাস্টটা ভাল খোলে। কপালে একটা টিকার মতো টিপ। চুলগুলোকে সে গোছা করে একটা ক্লিপ দিয়ে নিয়েছিল, যাতে আলুথালু দেখায়। দেখলেই চোখে পড়ে। পরিস্থিতির বিশ্লেষণ তার এক্কেবারে সঠিক।

'তা হলে পার্ক স্ট্রিটে চল।' যেতে যেতে কাজল বলে 'তোর বউকে তুলে নিবি নাকি ?'

'তা হলে তো যোধপুর পার্ক অব্দি যেতে হয়। তা ছাড়া দুই পুরনো বন্ধুর দেখা— এর মধ্যে আবার বউ-ফউ কী ? তা হলে তোর মাস্টারমশাইকেও নিয়ে যেতে হয়, আড্ডার দফারফা !'

ভাল করে গুছিয়ে বসে কাজল বলে, 'ইস্‌স্ কী ভাল যে লাগছে। সেই

কফি হাউসের দিনগুলো যেন ফিরে এল।'

'ফিরিবে না ফিরিবে না, অস্ত গেছে সে গৌরব-শশী'— ছদ্ম বিষাদের সুর লাগে চন্দনের গলায়।

'ফিরিবে না কেন ? শশী এখন তোর উদরে বিরাজ করছে।'

'খুব মোটা হয়ে গেছি, না ? এ হে হে হে'—চন্দন তার ভুঁড়ি থাবড়ায়। 'আর বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছর বয়স হল...'

কাজল বলে, 'এমন করে বলছিস যেন বির-আশি। এই তো সবে কলির সন্ধে তোদের। তোকে হঠাৎ দেখলে চিনতে পারতুম না। এই যা। সেই ন্যাংলা প্যাংলা কনেচন্দন যার বুশ শার্ট দুলতে আরম্ভ করলে কোথাও থামত না, সে এই রকম আগরওয়ালমার্কা হয়ে দাঁড়াবে এ কি ভাবা যায় ? হ্যাঁরে নাকু কোথায় ?'

'নাকু ? নাকু কে ?'

'মনে নেই টি. এস.-এর কাছে গিয়ে এক হল ছেলেমেয়ের সামনে জয়ন্তী জিজ্ঞেস করেছিল— 'স্যার নাকু কত পেয়েছে ? তোরাও তো ছিলি ?'

'ওহো সেই সর্বেশ ? টেনিদার মতো নাক যার ? তাকে তোরা নাকু বলতিস বুঝি ?'

'তবে ? তোরা একাই নাম দিবি ? আমার স্টকে অনেক আছে। নাকুর খবর বল।'

'নাকু বোধ হয় ফুড কর্পোরেশনে আছে। আমার সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই। তা নাকুর খবরে তোর এত কী ইন্টারেস্ট কাজলা ? ছিল নাকি কিছু ?'

কাজল হাসি থামাতে পারে না।

'নাকুর সঙ্গে আমার ? ও তো জয়ন্তীকে প্রোপোজ করেছিল, সেই জন্যেই তো জয়ন্তী ওর ইকনমিক্সের মার্কস জিজ্ঞেস করে।'

'জয়ন্তীকে সর্বেশ ? ওহ্ গড। সর্বেশকে তো জয়ন্তী পিং পং বলের মতো লোফালুফি করতে পারে। ওকে তো আমরা জয়ন্ত বলতুম। কী লম্বা লম্বা পা ফেলে চলত বলত !'

'অ্যাথলীট মেয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলবে না তো কি তোর মতো খুরখুর করে হাঁটবে !'

'আরে শিল্পী যে তোর মামার বাড়ির পাড়ার মেয়ে, তোদের অত ভাব তা তো জানতুম না। বিয়ের দিনে তোকে দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

'কেন, ঘাবড়ালি কেন ?'

'আরে কত কীর্তি করেছি, বলে দিলে তো সারা জীবন বউয়ের হাতে একটা অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।'

চা খাওয়াটা হাই-টি গোছের হয়ে গেল। পে করে দেবার পর কাজল বলল— 'বিলটা আমায় দিস তো !'

'কেন ? শোধ করবি নাকি ?'

'অত টক খায় না।' কাজল বলল, 'এক দিন ভারী খাইয়েছিস তার আবার শোধ। বেশ ভাল করে আর এক দিন খাওয়া তো। সিনেমা দেখা একটা।'

'আজকাল আর সিনেমা কেউ দেখে ?'

'তবে "কথা অমৃত সমান"টা দেখা।'

'ঠিক আছে, টিকিট কেটে বলব।'

'বউ নয় কিন্তু। তুই আর আমি।'

'নাটক দেখার ধৈর্য তোর শিল্পীর নেই।'

শিল্পী কদিন পর দুপুরবেলা ফোন করে বলল, 'কাজলদি তৈরি থেকো, আজ টিকটিকি।'

'মানে ?'

'সৌমিত্রর "টিকটিকি" গো, তোমার বন্ধু টিকিট কেটেছে। তোমাকে তুলে নেবে। আমায় জানিয়ে দিতে বলল।'

'চালাক তো কম না ?'— কাজল বলল।

'শুধু চালাক ? রাম চালাক। ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দাও।'

তখন থেকেই কাজল কনেচন্দনকে ঘোল খাওয়াচ্ছে। হাওড়া স্টেশনে বন্ধুকে আর মেয়েকে আনতে হবে— চন্দন। ভাল 'ছাতু' মানে মাশরুম মাণিকতলার বাজারে পাওয়া যায়, কই মাছের সঙ্গে দারুণ জমে, কাজল কিনে রেখেছে, চন্দন অফিস থেকে ফেরার পথে তুলে নিয়ে যাক। নিউ মার্কেট থেকে বাছা বাছা অ্যালফানসো দসেরী আর চৌসা কাজলের জন্মদিনে চন্দন নিয়ে আসে। কাজল তাকে রাত দশটা পর্যন্ত আটকে রেখে দেয়। তীর্ণা অনীক কাজল চন্দন মিলে কাজলের জন্মদিনের রান্না হয়। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঢুলতে ঢুলতে চন্দন বাড়ি ফেরে।

দক্ষিণাপণে বাজার করতে যাবে কাজল, চন্দন ছাড়া কে নিয়ে যাবে কাজলাকে ? কত পেছনে লেগেছিস এক দিন চন্নন, সে কথা মনে করেও একটু প্রায়শ্চিত্ত কর। কাজলের একটা বালুচরি পছন্দ হয়, ঘিয়ে রং-এর ওপর আইসক্রিম পিংক হরিণের নকশা। কাজলের অত ট্যাঁকের জোর নেই বাবা। নিজের জন্য অত খরচ করা কাজল ভাবতেই পারে না। সে এসেছিল মেয়ের জন্য গুর্জরী ঘাঘরা কিনতে। তাতে কী আছে ? চন্দন তার কলেজি-বন্ধু জন্মের মধ্যে কম্ম একটা বালুচরি কাজলাকে কিনে দিতে পারে না ?

শাড়ির প্যাকেট হাতে— কাজলের দিকে তাকিয়ে চন্দন বলে— 'তোকে যা মানাবে না কাজলা ? কলেজ ডেজ-এ ছিলি ফিঙে পাখির মতো। এখন তোর চেহারায় একটা ময়ূর ময়ূর জেল্লা এসেছে। তখন যদি জানতাম, এ রকম নীলময়ূরী দাঁড়াবি...'

'কী করতিস তালে ?' ঝকঝকে হেসে কাজল জিজ্ঞেস করে।

'কথাটা কী জানিস,' চন্দন প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলে, 'খুনসুটির পেছনের সাইকলজি হল, মনোযোগ অ্যাট্রাক্ট করা। এখন বুঝি, ওগুলো ছিল ময়ূরের

মাচ, বুঝলি তো ? যৌবন জলতরঙ্গ... ।'

'আমিও কি জানতুম, এই ন্যাংলা প্যাংলা পটলডাঙার প্যালারাম এক জন বিশ হাজারি দাঁড়াবে ?'

'জানলে কী করতিস ?' চন্দন জিজ্ঞেস করে ।

'কী আর করতুম, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ময়ূরের ন্যাজ-নাড়া দেখতুম ।'

'তুই শুধু টাকাটাই দেখলি কাজলা, মেয়েরা বড্ড অর্থপিশাচ ! বউকেও দেখেছি, টাকা ছাড়া একটা পা চলে না । তুইও ?'

'তুই দুঃখু পেলি ?' কাজল চুক চুক করে তার দরদ জানায়, তারপরে বলে 'শুধু বিশ হাজার কেন, এই যে এ রকম শশীকাপুরের ডুপ্লিকেট দাঁড়াবি তা-ও তো জানতুম না । শিল্পীর বিয়েতে গিয়ে তোকে দেখে তো আমি প্রায় মুচ্ছো যাই ।'

'বলছিস ! বলছিস !'

'তবে ?'

'এই শাড়িটা পরলেই তোর আমার কথা মনে পড়বে । এটাই লাভ ।' উদাস গলায় চন্দন বলে ।

কাজলও কম যায় না বলে, 'উপহার শুধু নিতে নেই, দিতেও হয় তা জানিস ? তবে আমার তো তোর মতো টাকা নেই, দিল কিন্তু আছে । তুই তো স্যুট পরিস ?'

'হ্যাঁ শীতকালে তো পরিই ।'

'তোকে একটা পছন্দসই টাই কিনে দিই ।'

'দে ।' কাজলা উপহার দেবে, চন্দন উদার ।

কাজল একটা চমৎকার টাই কেনে, তারপর একটা হ্যাট কেনে । 'ধুর, হ্যাট কিনছিস কেন ?'

'চমৎকার হ্যাটটা, বিদেশে যখন যাবি, পরবি । তুই তো প্রায়ই যাস । কমপ্লিট স্যুট হয়ে গেল ।'

ভোরবেলায় শিল্পী ফোন করল, 'কাজলদি, বরকে ঘোল খাওয়াতে বলেছিলুম । তুমি একেবারে টুপি পরিয়ে দিলে ?'

দুই বন্ধু হু হু করে হাসতে লাগল । শিল্পী বলল— 'ও এখনও বোঝেনি জানো ? এসে বলে 'কাজলীকে একটা বালুচরি কিনে দিলুম— মনে রাখবে চন্দন বলে একটা বন্ধু ছিল, তোমার হিংসে হচ্ছে না তো ?'

'তুই কী বললি?'

আমি বললুম, 'হিংসে ? সেটা কী জিনিস গো ? তখন আমাকে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে বললে— এই না হলে চন্নন বরাটের বউ ? তা কাজলাও উপহার দিয়েছে, বলে খুলে দ্যাখাল । আমার তো পেট গুলিয়ে হাসি পাচ্ছে, হঠাৎ ভীষণ পেটব্যথা করছে বলে উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজেছি । কী হল ?

কী হল ? বলে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি !'

'তারপর ?'

'তারপর ডাক্তারকে ফোন করতে যায় ! ডাক্তার অ্যান্টাসিড খেতে বলেন ।'

'খেলি ?'

'পা-গল । বললুম বাবাকে বলো, বাবা ভাল হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেন । বাবার কাছে দৌড়ল নীচে ।'

'ওষুধ আনল ।'

'আনল না আবার ? গরম জলে ম্যাগ ফস ।'

'খেলি ?'

'তারিয়ে তারিয়ে খেলুম । ব্যথা ভ্যানিশ । বাবার গুণগান । হ্যানিম্যান সাহেবকে থ্যাংকস ।'

'তারপর ?'

'উফ, সমস্ত প্রাইভেট কথা তোমাকে জানতে হবে ?' বলে শিল্পী দুম করে ফোন রেখে দিল ।

কাজলের সঙ্গে কোলাকুলি

কিন্তু মে গিয়ে জুন এল, জুন গিয়ে জুলাইও যায় যায় । আকাশের স্টকে যত জল ছিল আকাশ সব ঢালল, কলকাতা এবং তার প্রান্তিক অঞ্চলে যত আবর্জনা ছিল সব পচলো, যত ধুলো ছিল সব কাদার দঁক সৃষ্টি করল, যেখানে যত পড়ে-থাকা জমি ছিল সব বন হয়ে গেল । জমা জলে লাইভ-ওয়্যার পড়ে, জমে যাওয়া আবর্জনার পাহাড় ধসে পড়ে, আন্ত্রিকে, নৌকাডুবিতে, আরও কত কী-তে কলকাতার জনসংখ্যা কমল, পাশের রাজ্য থেকে দেশোয়ালি ভাইরা দলে দলে এসে সে ঘাটতি পূরণ করে দিল, মন্ত্রীরা সব আহিস্তা আহিস্তা হাওয়ালামুক্ত হয়ে যেতে থাকলেন । অন্য মন্ত্রীদের নামে চার্জশীট বেরোতে থাকল, হাওড়া কোর্টে পানীয় জল না থাকায় কোর্টে স্ট্রাইক হয়ে গেল, হাওড়া গার্লস কলেজে পানীয় জল না থাকায়, জলের বোতলের বিক্রি বেড়ে গেল, হকারমুক্ত গড়িয়াহাট শ্যামবাজারে ফ্যাশনেবল মহিলারা কাটা ঘুড়ির মতো দিক দিশাহীন উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে লাগলেন, কোকা-কোলা পেপসির বিজ্ঞাপন যুদ্ধ জমে উঠল, মিইয়ে গেল আবার জমে উঠল, বাজার থেকে মাছ উধাও হয়ে যেতে লাগল, র‍্যাশনপ্রথা উঠে যেতে থাকল— সুমিতার খবর নেই । শুধু সুমিতা কেন ? মালবিকাদিরও খবর নেই ।

'কি রে কাজলা মালবিকাদির মহিলাসমিতি তো তোর নাকের ডগায় ! খোঁজ

নিতে পারিস না ! ফোন না হয় না-ই করলি, গঙ্গাদার পয়সা চাট্টি বাঁচাতে !'

'গঙ্গাদার পয়সা ? গঙ্গাদা যমুনাদা বলে কাউকে আমি চিনি না তো, অ্যাঁ তুই আমার বরের কথা বলছিস ? তোর গঙ্গাপ্রসাদবাবু আবার গঙ্গাদা হল কবে থেকে ? অ্যাঁ ?'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বলি— 'মড়াকান্না জুড়বি মনে হচ্ছে ? দশ বারো দিন এক বাড়িতে বাস করলুম দাদা বললে দোষ হল ! গম্ভীর-গাম্ভার মানুষ, কোনওদিন তো এত কাছ থেকে দেখিনি !'

'কত কাছ থেকে দেখেছিস ? দূর থেকে ভুন্ডিল মুনি দেখতিস, কাছে আসতেই ঋষ্যশৃঙ্গ হয়ে গেল ? বা বা বা ! "তপস্বী ও তরঙ্গিণী"র সবটাই প্লে করলি বোধ হয় !'

'বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস কাজলা ।'

'বাড়াবাড়ি ? আমি কোথায় তোকে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। সিরিয়াস টাইপের মেয়ে। তোর এই কীর্তি ? তাই সে শান্তিনিকেতন থেকে ফিরতে চাইছে না। স্মৃতির মাটি আঁকড়ে আছে বোধ হয় ।'

'কেন, তুই যে বলিস বর না থাকলে তোর বাড়িও শান্তিনিকেতন থাকে !'

'কখনও তা বলিনি, আমি বলেছি সে-ও শান্তিনিকেতনে আমিও শান্তিনিকেতনে ।'

'দুটো তো একই হল ।'

'এই না কি তুই লেখিকা ? সামান্য দুটো উক্তির তফাত ধরতে পারিস না ? ছ্যাঃ ছ্যাঃ। তাকে গিয়ে সাতখানা করে লাগিয়েছিস বোধ হয়। এইটাই ছিল তোর প্রথম চাল ।'

'ভাল হচ্ছে না কাজলা, সাতখানা আটখানা ছেড়ে আধখানা সিকিখানাও লাগাইনি। আমি ও সব লাগানি-ভাঙানি করি না। যা বলার লেখার মধ্যে দিয়ে বলি। পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান টাং ।'

'থ্রেট করছিস ?' বলে কাজলা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

আমি তাড়াতাড়ি ফোন রেখে শেফালিকে বললাম— 'শেফালি আমি একটু আসছি ।'

'কোথায় আবার চললে এই দুকুরবেলায় ?'

'দুপুর তো কী ? দরকার আছে, কাজলের বাড়ি যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হলে দাদাকে বলিস, শান্তকে বলিস ।'

'আবার দেরিও হবে ? উপন্যাসখানা কে শেষ করবে শুনি ? বিধুভূষণবাবু যে সেদিন তাগাদা করে গেল !'

বুঝুন ব্যাপার, আমার কাজের মেয়ে শেফালি আমাকে লেখার গাফিলতির জন্যে ধমকাচ্ছে।

আমি রেগে-মেগে বললুম— 'কাগজ রইল, কলম রইল, তোর যখন অত

চিন্তা তুই-ই শেষ কর উপন্যাসখানা ।'

'জানি জানি আমি ঝি। আমি মুখ্যু। লেখাজোকার কথা মুখে আনাও আমার ...' গলায় অভিমানের গাঢ় মেঘ। আমি এখন ঘর সামলাই না বার সামলাই ?

'ঝি মানে কী জানিস তো ? মেয়ে। "ঝিকে মেরে বউকে শেখানো" শুনেছিস তো ?'

'সে আমি জানি গো বউদি। শাউড়ি তো আগে বউকে মারে না, আগে বাড়ির ঝির গায়ে খানকতক বসিয়ে দেয় ।'

'উফ্‌ফ্‌ফ—'

'ঝিউড়ি মেয়ে, শুনেছিস ?' বলতে বলতে আমি মরিয়ার মতো চটিতে পা গলাতে থাকি। কাজলকে আমি আজ অবধি কোনওদিন কাঁদতে দেখিনি।

টুনটুনি পাখির মতো কাজল তুর তুর করে হাঁটত, হাঁটা না ছোটা বোঝা যেত না। রামরতন বোসের লেনে কাজলরেখার বাপের বাড়ি। আমরা থাকতুম ঠিক ওর পাশের বাড়ি। সারা শীতকাল আমরা পুতুল খেলতাম। কাজলদের দোতলায় একটা আধখানা ছাত ছিল। সেইখানে সারা শীত ইঁট-সাজিয়ে তৈরি পুতুলের বাড়িতে দোতলার বারান্দায় কাজলের সবচেয়ে ফেভারিট পুতুল-বউ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। রান্তা দেখছে, যেমন আমাদের মা মাসি কাকি বউদিরা দেখেন। কাজলের উদ্ভাবনী প্রতিভা দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতুম। নিজেই পুতুলের সংসারের ধোপা হয়ে পুতুলের কাপড়ের রং জোরজার করে উঠিয়ে বা গরম ইস্ত্রি দিয়ে পুড়িয়ে নিজেই আবার পুতুল-গিন্নি হয়ে নিজেকে বকত। কাজলের পুতুল মরে গেলে তার দাহকার্য হত। পুতুলের বিয়ে হলে লুচি, বেগুনভাজা খাওয়া হত, ওর পুতুলের বাড়িতে চুরি-ডাকাতি হত। বলা বাহুল্য কাজল নিজেই সেই চোর, সেই ডাকাত, এবং সেই চোর ডাকাত ধরা পুলিশ। মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা একটা কাচ কড়ার পুতুল কাজলের ছিল। সে-ই দরকার মতো পুলিশ, দরকার মতো সেপাই আবার দরকার মতো সেনাপতি-টতি হত। এক বার আমার পুতুল-ছেলের সঙ্গে কাজলার পুতুল-মেয়ের বিয়ে হল, বিয়ের রাতেই আমার ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো কাচের পুতুল-ছেলে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। কাজল তার পুতুল-মেয়েকে বিধবা সাজাল। সে কী আনন্দ কাজলার পুতুল-মেয়ে বিধবা হতে। নতুন কিছু করা গেল তো ! থানকাপড় জোগাড় করা বাবার ধুতি কেটে, পাথরের ছোট ছোট থালা বাসন কেনা পুতুল হবিষ্যি করবে বলে। তখন আমরা কাচের পুতুল মাটির পুতুলের মাথায় আঠা লাগিয়ে তাতে কালোসুতোর গোছা এঁটে চুল তৈরি করতাম। কাজল তার নয়নের মণি পুতুল-মেয়ের মাথার সেই গোছা-চুল ঘ্যাঁচ করে কেটে দিল। অবিকল ওর ঠাকুমার মতো করে। সে মেয়ে রাত্তিরে সকড়ি জিনিস খেত না, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যায় উপোস করত। কিছুদিন এভাবে চলবার পর অবশ্য এক দিন গিয়ে শুনলাম

পুতুল-মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তাই বলে সেটা বিধবা-বিবাহ নয় মোটেই। আসলে সেই পুতুল-মেয়ে আগে ছিল প্রতিমা, এখন হয়েছে ঝর্ণা, তার আইডেনটিটি বদলে গেছে। মাথায় আবার চুলের গোছা। মাঝসিঁথিতে বেশ করে আবির লেপা। পরনে এমব্রয়ডারি করা ঘাঘরা, ওড়না, মডার্ন মেয়ে শাড়ি-টাড়ি পরে না।

সেই কাজল ভ্যাঁ ?

আমরা সে সময়ে দেশবন্ধু পার্কের সংলগ্ন লেডিজ পার্কে খেলতে যেতাম। কলকে ফুলের মধু খাওয়া এবং কলকে ফুলের মালা, মুকুট ইত্যাদি তৈরি করে পরা, পরস্পরকে পরানো আমাদের অবশ্য করণীয় ছিল। নানা ধরনের মেয়ে যেত লেডিজ পার্কে। আমাদের খেলুড়ি কিছু কুচো ছেলেও দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে ঢুকে যেত। বুড়ি-বসন্তী খেলা নিয়ে খুব মন-কষাকষি হত। এই খেলায় লিডার তার দলের খেলুড়িদের একটা করে নাম দেয়। ফুল ঠিক হলে ফুল, ফল ঠিক হলে ফল। অপর পার্টির খেলুড়ির চোখ টিপে ধরে তাকে বলতে হবে, 'আয় তো আমার জবা'— জবা গোপন নামধারী মেয়েটি এসে চোখ টিপে থাকা মেয়েটির মাথায় টুক করে মেরে যাবে। এবার চোখ-টেপা মেয়েকে বলতে হবে কে মেরেছে, কে সেই জবা। কাজল তার সহ-খেলুড়িদের নানা কৌশল করে এই নামটি জানিয়ে দিত। ফলে চোট্টামির জন্য তার অনেক খোয়ার হত। এদের মধ্যে একটা ছিল 'যা যা কেলে ভূত, তোর বিয়ে হবে না।' তখন কাজল কোমরে হাত দিয়ে মাথা উঁচু করে বলত— 'হবে না তো হবে না, ভালই তো। বিয়ে না হলে বিধবাও হব না। তোরা যখন একাদশী করবি আমি তখন পার্শে মাছ ভাজা, পার্শে মাছের ঝাল, পার্শে মাছের ডিম তারিয়ে তারিয়ে খাব।'

সেই সব প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী মনে করে আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়।

ইয়ার্কি বাজ, ফাজিল, ফক্কড় হলে কী হবে, আমার 'গঙ্গাদা' থেকে কাজল কিছু একটা ভেবে নিয়েছে। কী সেনসিটিভ মেয়ে দেখো !

গিয়ে দেখি, দরজা খোলা, বৈঠকখানা ঘরে অনীক-তীর্ণা-গোপাল সব আড্ডা মারছে। আমাকে দেখে বলল— 'তোমার জন্যে দরজা খুলে রেখেছি মাসি। মা ওপরে। শিগগির যাও।'

আমি রাগ করে বলি—'বাবা, বাবা, তোদের আড্ডায় অংশ নেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। দেখলেই যাও যাও, যাচ্ছেতাই একেবারে।'

অনীক হেসে বলে— 'বেশি ডায়ালগ মচাচ্ছো কেন মাসি, পাশের ঘরে ঘাপটি মেরে বসে আমাদের পেরাইভেট হাপিশ করে কে ?'

গোপাল বললে— 'মাসি বেশি পানকৌড়ি কোরো না। ডুবে যাবে, ডুবে যাবে।'

তীর্ণা বলে— 'না গো মাসি, মা বলে দিল নীচে এসে দরজা খুলে বসে

থাকতে। তুমি এলেই যেন সত্বর ওপরে পাঠিয়ে দিই।'

'তাই বলে তোর দাদা আর তার বন্ধু আমাকে এমন অপমান করবে ?'

'অকমান ? অকমান কই মাসি ?' গোপলা দু হাতে নিজের দু কান ধরল, বলল— 'তোমাকে একটু স্যাম্পেল দিলুম আর কি। আর ঘাপটি মারতে হবে না !'

'স্যাম্পেল তো চিজ মানে 'মাল'কে বলে ?'

'রোজ কত ইউসেজ ফুটে ঝোপড় হয়ে যাচ্ছে, কত নামছে তুমি তার কী জানো মাসি। যাও যাও শিগগির যাও, দেরি দেখলেই কাজলামাসি ডিঙি মেরে নীচে নেমে আসবে। বাস, আমাদের আড্ডা ফুটকড়াই।'

আমি ধীরে ধীরে ওপরে উঠি। যদি আর কিছু কানে আসে। দোতলায় উঠে কাজলদের দালান। একদিকটা গ্রিল দিয়ে ঘেরা। বাকি তিনদিক ঘর। কোণের ঘরটা কাজলার। কোনও সাড়া শব্দ নেই।

ঢুকেই আমি স্থির হয়ে গেছি। কাজলা বিছানায় শোওয়া, মাথাটা একদিকে হেলে পড়েছে। খোলা চুল বালিশময় ছড়ানো। হলুদ রঙের শাড়ির আঁচল মেঝেতে লুটোচ্ছে। পাশে একটা খালি শিশি, একটা খালি গেলাস।

খানিকটা মাথার দিক থেকে দেখি, খানিকটা পায়ের দিক থেকে দেখি, তারপর আচ্ছা করে কাতুকুতু দিই।

—'অ্যাই অ্যাই কী হচ্ছে ? কী হচ্ছে ?' — বলে কিলবিল করতে করতে কাজল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আঁচল গোছায়।

দুজনের হাসি-কাশি সব থামলে পর কাজল বলল—'নাকের নীচে হাত দিয়ে দেখছিলি কেন বোকা ? ঘুমের ওষুধ খেলে কি তক্ষুনি-তক্ষুনি মরে যায় না কি। নিশ্বাসও বয়, বুক ওঠা-পড়াও করে।'

'সেই জন্যেই তো শিওর হওয়ার জন্যে কাতুকুতু দিলুম।'

'আমি ভেবেছিলুম জল দিবি। জলের কুঁজোটা ঘর থেকে সরিয়ে রেখেছি তবুও শিটিয়ে ছিলুম।'

আমি বললুম—'এবার বল টেলিফোনে ভ্যাঁ করলি কেন ?'

'তোর পাপ মন তাই অ্যাঁকে ভ্যাঁ শুনিস।'

'ফোঁৎ ফোঁৎ-ও শুনেছি। ডিসটিংট ফোঁপানির আওয়াজ।'

'হাসি। হাসি। হাসি চাপার প্রয়াস, গঙ্গাদা আমি জীবনে শুনিনি। এরপর যদি কেউ নীলিমাদা, প্রতিমাদা, মানসীদা বলতে আরম্ভ করে ?'

'করতেই পারে, রমাপ্রসাদ, রমণীরঞ্জন, সুনীতিকুমার—এঁদের লোকে কী বলে ডাকবে বল—রমাদা, রমণীদা, সুনীতিদা ছাড়া। এ তো তবু ভাল। জানিস বাণী বলে আমার এক বন্ধু আছে তার কাছে প্রায়ই বাণীবাবু বলে চিঠি আসে। ফোন করে লোকে বাণীদাকে চায়। ব্রত নয়, কুমার নয়, শুধু বাণী—তারই এই দশা।'

'তোর বন্ধুকে দুঃখু করতে বারণ করিস। নীচে যে ওই গোপাল দেখলি

না। এক নম্বরের বিচ্ছু ছেলে। আমাকে কাজল মেসোমশাই বলে আড়ালে। আমার ছেলে-মেয়েও সে সব সহ্য করে। তা সে যাই হোক গে রঞ্জু, আজ একটা নাটক করলুম বটে, কিন্তু এ রকম আমি সত্যিও করতে পারি।'

'এই যে বললি, ফোনে হাসছিলি ?'

'ফোনের সঙ্গে এই সিনের কী সম্পর্ক ? কোনও সম্পর্ক নেই। আমি শুধু তোকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি, ভুণ্ডিল মুনি হোক শুণ্ডিলমুনি হোক লোকটা একমাত্তর একা আমার। তা ছাড়া রসের জালা লোকটা, আমার জানা আছে।'

'সুরঞ্জনা। আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো—টাছো খুব ভাল আবৃত্তি করে। তুই ও সব শুনবি না।'

'বা রে বা। তোমার বর হতে পারে, তা বলে তার আবৃত্তি আমার শোনা বারণ ? বেশ আবদার তো ! সুমিতার নালিশগুলো তো তা হলে দেখছি ঠিক ?'

'আহা, অন্য সব শুনবি, 'সুরঞ্জনা'টা নিয়েই আমার ভয়। কবিতার আড়ালে যদি সত্যি-সত্যি তোকে প্রেম-নিবেদন করে বোঝা যাবে না তো !'

'সুরঞ্জনা মোটেই প্রেমের কবিতা নয় কাজল ?'

"মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'টা কোথায় আছে বাছা ?" শালবনের ছায়ায় ছায়ায় সন্ধের ঝুঁঝকো আঁধারে যদি এটা তোকে বলে থেকে থাকে !'

আমি ভেতরে ভেতরে চমকে উঠেছি।

'তোর ভয় নেই'। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বলি, 'তোর ভুণ্ডিল তোরই থাক, আর আমার ভণ্ডুল আমার, শুধু প্রিয়া রেস্তোরাঁর বিলগুলো রাখ।'

'আর একটা টেবিলে বাবা জেনকিন্‌স এবং মা-তীর্থও পরোটা-মাংস খাচ্ছিলেন, কাজেই জীবনানন্দ কোট করার তেমন সুযোগ তোর ভুণ্ডিল পায়নি।'

'আরে তুই তো কামাল করে দিয়েছিস রে রঞ্জু, এক টেবিলে তুই আর গঙ্গাপ্রসাদ ?—জীবনে কোনওদিন কোনও দূর-শালীর সঙ্গেও গঙ্গাপ্রসাদ এক টেবিলে বসে ভাত খায়নি। ভীষণ ছুঁৎ-মার্গ। বেশি ছুঁচিবাই মানে আবার ভেতরে ভেতরে ছোঁক ছোঁক বুঝিস তো ?'

আমি বললুম 'কাজলা, অসভ্যতা করিস না, ছিঃ।'

কেন এই অকমান ?

কিন্তু সুমিতার কী হল ? মালবিকাদিরই বা কী খবর ? কাজলও জানে না, আমিও জানি না, শিল্পীও জানে না।

মালবিকাদির বাড়িতে শরিকে শরিকে আবার বিবাদ শুরু হয়েছে। মালবিকাদিকে কেউ ফোন করলেই কেটে দিচ্ছে। শ্যামপুকুরের সমিতিতে কোনও ফোনই নেই। সুমিতাদের বাড়ি ঝিনঝিন করে ফোন বেজে যাচ্ছে।

কেউ ধরছে না। অর্থাৎ হয় বাড়িসুদ্ধ সবাই হাওয়া খেতে গেছে, নয় ফোন খারাপ। ফলস রিং হচ্ছে। সুমিতার কলেজের নম্বর টিপতে খালি একটা হেঁড়ে মতো মেয়ে-গলা বলে 'ইয়ে নাম্বার মওজুদ নহী হ্যায়।'

ঘন ঘোর বর্ষা। রাস্তায় যখন তখন হাঁটু জল জমে যাচ্ছে। আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সারা দিন খালি শেফালির মুখ। খুন্তি হাতে কেষ্ট ঠাকুরের মতো বেঁকে দাঁড়াবে দরজার পাশকাঠে ঠেস দিয়ে। 'ইস বউদি, আজকে আমার হয়েছিল আর কী। অ্যাকসিডেন থেকে ঠাকুর বাঁচিয়েছেন। একটা মুখপোড়া তিন ঠেঙে অটো একেবারে ধড়ধড় করে মুখের সামনে।'

রোজই ওকে অ্যাকসিডেন থেকে ঠাকুর বাঁচান। হাঁটুর পেছনে আঁচড়, গোড়ালিতে ফোঁড়া, কনুইয়ে নুনছাল উঠে যাওয়া এর কোনওটা না কোনওটা ওর নিত্যদিন হবে। আমাকে তার বিশদ বিবরণ শুনতে হবে। দেখবার হলে দেখতে হবে, ওষুধ দিতে হবে। মানে ওষুধ বাতলাতে হবে, কিন্তু সে ওষুধ শেফালি ছোঁবে না। যদি আমি কোনও সাধারণ অ্যান্টি-সেপটিক মলমের নাম করি, টিউব দিই, শেফালি ঈষৎ মুখ বেঁকিয়ে বলবে 'এ তো তুমি শীতকালে মুখে মাখো গো। এতে কী আর হবে ?' যদি বলি 'মোড়ের ওষুধের দোকান থেকে ইনজেকশন নিয়ে আয় লিখে দিচ্ছি।' ও বলবে 'ডাক্তার দেখল না, বদ্যি এল না, তোমার কথায় অমনি ফুঁড়িয়ে আসব অত বোকা তুমি আমায় পাওনি।'

বেশ কিছুক্ষণ ভ্যাজর ভ্যাজর করার পর 'অ্যাল' বলে এতখানি জিভ কেটে বলবে—'ও মা, তোমার ডিসটাব হচ্ছে। তুমি তো লিখছ আমার ধারণা আমি লিখছি কি না দেখতেই ও আসে। পাহারাঅলা। বিধুভূষণবাবুই ওকে টিকটিকি লাগিয়েছেন কি না কে জানে !

কাজলের কাছে প্রস্তাব দিই—'এক দিন জয় মা বলে বেরিয়ে পড়া যাক'—মালবিকাদির সমিতিতে এক দিন, সেটা হাতের কাছে, কোনও ব্যাপার নয়, আরেক দিন সুমিতার কলেজে সেটা দক্ষিণ শহরতলিতে, গুরুতর ব্যাপার।

মালবিকাদির মহিলা সমিতিতে গেলে আমার একইসঙ্গে মন খারাপ এবং মন ভাল হয়ে যায়। ভাল হয় কেন না, এতগুলি মেয়ে প্রতিকূল পরিবেশ কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে, আর্থিক স্বাধীনতার সুযোগ পাচ্ছে। এ তো খুবই আনন্দের কথা। মন খারাপ হয় এই জন্যে যে মানুষের জীবন তো শুধু দুটি অন্ন খুঁটি খাবার জন্যে নয়। খাবার যোগাড়ের লড়াইয়েই এদের জীবন শেষ হয়ে গেল। এমনই অবস্থা এত দিন পরেও আমাদের দেশের যে জীবনে বাঁচার প্রথম ধাপটা টপকাবার প্রাণান্ত চেষ্টাতেই এখনও আমাদের সব চেষ্টা শেষ। কী রকম বিমর্ষ লাগে এখানে এলে। সেই জন্যে চট করে আসি না।

মালবিকাদি বলে 'তোরা কী জানিস তো ? এসকেপিস্ট। কোনও সত্যিকার প্রবলেমের সামনে কক্ষণো দাঁড়াবি না। ওই মধ্যবিত্ত সমাজে কে মা বাবাকে দেখল না, কোন শাশুড়ি বউকে দেখতে পারল না, কী ভাবে নোংরা ঝগড়া

ঝাঁটি করে অথবা না করে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেল, তারপর ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে টানাটানি, হেনস্থা—এই তোদের গল্পের বিষয়। কিম্বা তোরা বসে থাকবি গজদন্ত মিনারে সেখানে একাকিত্ব, বিচ্ছিন্নতাবোধ, পরকীয়া, বড় জোর সাম্যবাদীদের অসম আচরণ, ফান্ডামেন্টালিস্টদের ধাপ্পাবাজির স্যাটায়ার লিখবি। হোপলেস তোরা হোপলেস।'

মালবিকাদির ধারণা সত্যিকারের লেখার যোগ্য ইতিহাস তৈরি হচ্ছে, গল্প নাটক তৈরি হচ্ছে একমাত্র তার মহিলাসমিতিতে। যদিও আমাকে প্লট দিতে সে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয়।

বিন্দুদি আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। বিন্দু নাম আমি শরৎচন্দ্রে আর হিন্দি সিনেমা ছাড়া এই মালবিকা মহিলা-সমিতিতেই একমাত্র দেখছি শুনছি। তা সে যাই হোক বিন্দুদির সুগোল মুখ, বড়ি খোঁপা এবং গোটা শরীরের একটা সুবর্তুল ডৌল থাকার জন্য নামটা খুব জুতসই লাগে।

ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় করে অন্তত গোটা পনেরো সেলাইমেশিন চলছে। লং ক্লথ, পপলিনের শাদা ঝলকাচ্ছে। মেয়েদের এক হাত সেলাইয়ের কাপড় চাপাকলের ও ধারে টেনে ধরে আছে। আর এক হাত এ ধারে টেনে ধরে আছে। মুখ তুলে ওরা হাসছে আবার সেলাইয়ে মুখ ফেরাচ্ছে। প্রথম ঘর ছেড়ে আমরা দ্বিতীয় ঘরে যাই। এটাই বিন্দুদির অর্থাৎ কার্যনির্বাহী সম্পাদকের ঘর। এখানে ছুঁচের কাজ হচ্ছে।

'অ্যাই একদম মুখ তুলবি না, প্রতিটি ফোঁড় সমান হওয়া চাই।' বিন্দুদি প্রথমেই ধমক মারে।

তা সে যদি বুনো ওল হয় তো তার বাঘা তেঁতুলও আছে। একটি বেশ পোড়-খাওয়া চেহারার মেয়ে বলল—'তা যদি বলো বিন্দুদিদি তো তুম্মো তোমার হিসেবের খেরো থেকে মুখ তুলো না। মালুদিদি বলে দিয়েছে এখানে আমরা সবাই সমান? বলেনি কো? স্বামীজিও তো বলে গিয়েছেন—দরিদ্দ ভারতবাসী চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তা আমরা তো চাঁড়ালও নই বাপু।'

কথা কোথা থেকে কোথায় চলে এল। কাজল ফিসফিস করে বলল—'রোজ ক্লাস বসিয়ে স্বামীজী রবীন্দ্রনাথ এই সব পাঠ হয় এখানে, বুঝলি তো? এখন উগরোচ্ছে। একটা কবিতার সাবসট্যান্স করে এসেছে, যে কবিতাই আসুক সেই একটাই চালাচ্ছে।'

আমিও ফিসফিস করে বলি—'আসল কথা অ্যাপ্লিকেশন, প্রয়োগ। এই প্রয়োগটা মালবিকাদি শেখাতে পারছে না, বুঝলি?'

আমাদের সব ফিসফিসুনিই অবশ্য মাঠে মারা গেল, কারণ আমাদের সমালোচনার লক্ষ্য মালবিকাদি-ই অনুপস্থিত।

'সমিতির কাজ দেখতে এয়েছেন, না দিদির কাছে? কিছু কিনবেন?' বিন্দুদি 'চাঁড়ালও নই বাপু'—মহিলাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমাদের জিজ্ঞেস করল।

এখন সমিতির কাজ দেখতে আসিনি, সমিতির কর্মরত মেয়েদের সামনে বলাটা কেমন রূঢ় লাগে। কিছু কিনব কি না এটার উত্তর শোনবার জন্যেও নিশ্চয়ই মেয়েরা মুখিয়ে আছে। মালবিকাদিরও একটা মান-সম্মান আছে, তার বন্ধুদেরও স্বভাবতই মান-সম্মান আছে। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে কাজলা ঠোঁট-কাটার মতো বলল— 'আমাদের কিছু কেনবার নেই, বিন্দুদি, আগেরগুলোই এখনও তোলা আছে তবে এসেছি যখন...'

বিন্দুদি চোখ গোল-গোল করে বলল— 'ও মা, আপনারা এয়েচেন এই আমাদের কত ভাগ্যি। জিনিস কিনতে হবে— এমন কোনও কড়ার আছে না কি?— তা ছাড়া আমাদের বেশির ভাগ জিনিসই তো অর্ডার সাপ্লাইয়ের জিনিস— ছোঁয়া যাবে নাকো। ধরুন, পাজামা, পাঞ্জাবি, সায়া, নাইট-ফ্রক, টেপ-জামা, হাউস-কোট, অ্যাপ্রন, বাত-রোব, ঝোলা ব্যাগ। ... তবে শৌখিন যদি দেখতে চান...'

এইটেই বিন্দুদির কায়দা। জেনেশুনেও আমরা ফাঁদে পড়ি। কাজল দু হাজার দিয়ে একটা কাচের কাজ করা সিল্ক কিনে ফেলে। আসল দাম আড়াই। কিন্তু আমাদের জন্যে দুই। পেয়েবল হোয়েনেবল। ইনস্টলমেন্ট তার ওপর। আমি একটা অ্যাপলিকে আর ফ্যাব্রিক পেন্টিংয়ে চমৎকার খাদির ঝোলা ব্যাগ পেয়ে যাই, ভেতরে দুটো খাপ, সব লাইনিং দেওয়া। যেন আমার পাণ্ডুলিপি বইবার জন্যেই মাপ দিয়ে তৈরি হয়েছে। এ-ও দুশো আসল দাম, আমাদের জন্য দেড়শো, পেয়েবল হোয়েনেবল। ইনস্টলমেন্ট।

'এটা টু মাচ হয়ে যাচ্ছে রে রঞ্জু।' কাজলা বিবেক-পীড়িত কণ্ঠে বলে— 'দেড়শোটা টাকা— আবার বাকি রাখবি?'

'তাতে কী হয়েছে?' বিন্দুদি যথাসম্ভব মিষ্টি হেসে বলে— 'ও দু হাজারও যা দুশোও তা। কাস্টমার হল গিয়ে কাস্টমার। তার সুবিধে-অসুবিধেগুলোই আমরা আগে দেখি।'

লজ্জায় অবনত ও বিবেকপীড়িত হয়ে আমি একশো টাকা বার করে দিই। পঞ্চাশ রইল। কাজলা একটি পয়সা ঠেকাল না। দুজনের বিবেকের জ্বালা আমি একাই মেটালাম।

বেরিয়ে এসে সে-কথা বলতে, কাজলা ব্যাগ নাচিয়ে বলল— 'গজবে যাবি না? আধো আঁধারে আধা-আধুরি বসে বসে একটু আইসক্রিম, একটু কোল্ড কফি, সামান্য কিছু স্ন্যাকস, সঙ্গে আড্ডা, রেস্ত আমার কাছে।'

'গজব'-এ ঢুকতে যাচ্ছি, মনে পড়ল— এই যাঃ, মালবিকাদির কথা তো জিজ্ঞেস করা হল না?

'অবভিয়াসলি নেই, ওখানে। কী আর জিজ্ঞাসা করব?'

দু'জনে দু'জনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিভোর হয়ে 'গজবে'র সিঁড়ি বেয়ে চাতালে উঠেছি। দুপুরবেলা ফাঁকা টেবিল সব, দেখি শেষের টেবিলে আমাদের দিকে মুখ করে বসে স্বয়ং মালবিকা সান্যাল। সামনে আমাদের দিকে

পেছন একটি ভদ্রলোক। পেছন থেকেও আমি চিনতে পেরেছি শুভম। কত ছবি দেখিয়েছে সুমিতা। দুজনে মুখ নিচু করে কেমন ঘনিষ্ঠভাবে ফিসফিস করে কথা বলছে। হায় সুমিতা। হায় তোর প্রেম, তোর বিশ্বাস-অবিশ্বাস, হায় সুযোগ। সুযোগের অসৎ ব্যবহার। সুমিতা, তুই জিতে গিয়ে হেরে গেলি ভাই।

যথাসম্ভব আওয়াজ না করে, ওদের দিকে পেছন করে আলতোভাবে বসি।

'কিছু অর্ডার দিবি অ্যাট অল ?'— কাজলা ভারী-ভারী গলায় বলল।

'এসেছি যখন। উঠে যেতে তো আর পারি না'— আমার গলাও ভারী।

'ওরা লাঞ্চ খাচ্ছে। ঘড়িতে দুটো বেজে সাড়ে সাত মি., এখন লাঞ্চ খাওয়া হচ্ছে !'— কাজলা।

'অনেক ডিশ নিয়েছে। মোগলাই মনে হচ্ছে। কেশর জাফরানের গন্ধ পাচ্ছি।'—আমি।

'পারেও মালবিকাদিটা। এই সাঙ্ঘাতিক গরমে ! ঘাড় ভাঙবি বলে এই ভ্যাপসায় মোগলাই ?'— কাজল।

'তুই তো জানিস না, মালবিকাদিদের বাড়িশুদ্ধু খুব খাইয়ে। ওর বাবা ঝুড়ি করে ফিশফ্রাই খেতেন। মাত্র সাতের জন্য লেডিকেনির সেঞ্চুরি করতে পারেননি, পুরো খাওয়ার পর তো ? সেঞ্চুরি মিস হল বলে জীবনে আর কোনওদিন লেডিকেনি ছোঁননি।'— আমি।

'শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তা হলে মালবিকাদির খুব অসুবিধে হয়েছিল বল ? আমার পিসশাশুড়িই যখন আমার খাওয়া দেখে বলেছিলেন—"নতুন বউয়ের খাউন্তি দাউন্তি ভাল, তখন ..." কাজল।

'না রে সেদিক থেকে মালবিকাদির ভাগ্য ভাল। খাওয়ার বন্ধুর ছেলের সঙ্গেই তো মেয়ের বিয়ে দিলেন মালবিকাদির বাবা।'— আমি। 'খাওয়ার বন্ধু আবার কী ? এক গেলাসের ইয়ার বল'— কাজল শোধরাল।

'এক পাতে তো স্বামী-স্ত্রী আর ছোট্টছোট্ট ভাইবোনরা ছাড়া অপর আর কেউ খায় না— নইলে টাইফয়েডের পরে ডাক্তার জাওলা মাছের ঝোল ভাত পথ্য দিয়েছিলেন। ঝোল খেলেন কই মাছের, এক জামবাটি— দু কুড়ি কই। ডাক্তারবাবু সেই গল্প মালবিকাদির বাবাকে বলেন। তাইতেই মেসোমশাই লাফিয়ে উঠলেন— এই বাড়িতেই মেয়ের বিয়ে দেব, তা হলে খাওয়ার কষ্ট হবে না।'— আমি বিশদভাবে মালবিকাদির বিয়ের গল্প বলি।

'এত খেয়েও মালবিকাদিটা স্লিম থাকে কী করে বল তো !' কাজল ক্ষুব্ধ।

'অনেকের অমন হয়। গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়,— ভাগ্য !' আমিও ভাগ্যের একচোখোমিতে বিষণ্ণ।

পিঠে আঙুলের টোকা পড়ল। অবভিয়াসলি মালবিকাদি। এতক্ষণ ধরে তো আর ইনকগনিটো থাকতে পারি না। এতক্ষণেও যদি না চেনে তা হলে বলতে হবে ইচ্ছে করে চিনছে না।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি— মালবিকাদি নয়। শুভম। সুমিতার সেই বিশ্বাসঘাতক জাহাজি বর।

'আপনি বোধহয় রঞ্জুদি, উনি কাজলদি।— মালবিকাদি ডাকতে বললেন। পিঠে টোকা মারার জন্যে দুঃখিত। মালবিকাদি বললেন— ওইভাবে ডাকতে।'

'মালবিকাদি বললেন আর অমনি আপনি অজানা-অচেনা ভদ্রমহিলার পিঠে টোকা দিলেন ?'— কাজলা মার-মার করে উঠেছে।

'আমি আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু মালবিকাদি বললেন— এ আঙুল আপনারা মালবিকাদিরই আঙুল বলে ধরে নেবেন। ন্যাচার‍্যালি টোকাও তাঁর আঙুল যাঁর।'

'অদ্ভুত লজিক তো !'— আমি চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলি।

'কী বলছ, বলো !'— মালবিকাদির টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলি।

'দূরে বসে ফিসফিস করার মানে কী ?'— মালবিকাদি দাবি করে 'না চেনার ভান করার মানেই বা কী ?'

'কী জানি ফিসফিস কে করছে ? না চেনার ভানই বা করছে কে ?'— আমিও কম যাই না।

'শেষ পর্যন্ত তোদের ডাকতে পাঠালুম শুধু এই জন্যে যে দেখে যা মালবিকা সান্যাল যখন খায় বুক ফুলিয়ে খায়। কাউকে ভয় পায় না। খাবার চ্যালেঞ্জ তো তোরাই দিয়েছিলি। মালবিকা সে চ্যালেঞ্জ নিয়েছে।'

আমি ভালই বুঝতে পারি মালবিকাদি কিছু কিঞ্চিৎ রহস্য ভাষায় কথা বলছে যাতে আমরা এক রকম বুঝি, শুভম আরেক রকম বোঝে।

শুভম বললে— 'এইটে তোমার মহত্তম গুণ মালবিকাদি। খাওয়া নিয়ে টিপিক্যাল মেয়েদের মতো ন্যাকামি করো না। আসুন না, আপনারা এখানেই বসুন না।'

'আপনাদের টেবিলে আর জায়গা কই ? খাদ্যখাদ্যে ভরে ফেলেছেন তো !'

মালবিকাদি আবার দ্ব্যর্থক ভাষায় বলে— 'এই শুভ, খবরদার ওদের ডাকিস না, এটা তোর আমার আফেয়ার, ওরা ওদেরটা থাক।'

শুভম বলে— 'এ ছি ছি ছি, মালবিকাদি এটা ঠিক হচ্ছে না, এই প্রথম আলাপ হল ?'

'তুই প্রথম দেখে থাকতে পারিস, আমি খুব কাছ থেকে বহু বার দেখেছি, আর দেখবার সাধ নেই। এরা মনে এক, মুখে এক। আর তোর যদি ভদ্রতা করবার ইচ্ছে জাগে তো তুই যা, গিয়ে ওদের সঙ্গে পকোড়া মাকোড়া খেতে যা। আমি একাই দু প্লেট বিরিয়ানি সাবড়াব আজ, মদন চাটুজ্জের মেয়ে আমি, সাধন সান্যালের বউমা।'

মালবিকা সান্যালের সেই 'রণং দেহি' 'কুছ পরোয়া নেই' মূর্তির সামনে থেকে পত্রপাঠ পলায়ন করা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি। খুব রেগেছে।

শুভম হাতজোড় করে বলল— 'আমার ছুটি ফুরিয়ে এল। যাবার আগে আর এক দিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আশা করি।'

ফেরবার সময়ে কাজল আবার আটকে দিল। উত্তেজিত গলায় বলতে লাগল— 'আমাদের এত অপমান করার কারণটা মালবিকাদির কী বলে তোর মনে হয় ?'

'সত্যি ! অপমান বলে অপমান, কোথাকার কে শুভম তাকে কি না বলল— ওই ভদ্রমহিলার পিঠে আঙুলের টোকা দিয়ে এসো,— আঙুল, টোকা সবই নাকি প্রতিনিধিমূলক। শুভমের আঙুল ইকোয়ালস মালবিকাদির আঙুল। সুতরাং শুভমের আঙুলের টোকা ইকুয়ালস মালবিকাদির আঙুলের টোকা। জানিস এই টোকা কী সাংঘাতিক জিনিস ! আকাশবাণীতে সংস্কৃতি-সম্পর্কিত কোনও অনুষ্ঠানে প্রযোজক মশাই আমার দিদিকে, অঞ্জনাদিদি রে ? স্পিচ স্টার্ট করার জন্য হাতে আঙুলের টোকা দিয়ে জানান দিয়েছিলেন। আমার দিদি প্রযোজককে চড় মেরে রেডিয়ো স্টেশন থেকে চলে আসেন। যারা দিদির স্পিচ শোনবার জন্যে বসে ছিল তারা সবাই চড়ের আওয়াজ শুনতে পায়। সেই দিদির বোন আমার পিঠে কিনা আঙুলের টোকা ?'

'টোকা না খোঁচা না হাত বুলোনো তুই-ই ভাল বলতে পারবি।'

কাজল ব্যাপারটাকে জটিল করে দেবার চেষ্টা করে।

'ইট ওয়াজ পিওর টোকা'— আমি আমার জায়গায় অনড় থাকি।

'তা সে যাক। কেন এই অপমান ?'

'হ্যাঁ কেন এই অকমান ?'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তো আমার দিকে তাকিয়ে কাজল বললে— 'অকমানটা আবার কী ?'

'তোর মানে তোদের গোপালের থেকে শিখেছি।'

ভীষণ বিরক্ত হয়ে কাজল বললে— 'আমাদের মধ্যে আবার সেই চ্যাংকাটাকে আনার তোর দরকার কী ? ওর নাম করিসনি আমার কাছে। মুড অফ হয়ে যায় আমার।'

কাজলদের বৈঠকখানায় এখন কেউ নেই। অনীক দরজা খুলে দিল। আমরা বৈঠকখানায় বসলাম। কিছুক্ষণ পর অনীকই আমাদের চা দিয়ে গেল। বিস্কুট।

'আর কিছু লাগবে মাসি ? পান ? বিড়ি-সিগারেট ?'

'যা যা ফক্কড়, এখান থেকে যা এখন'— কাজল তেড়ে উঠল।

'যাচ্ছি, যাচ্ছি,' অনীক তাড়াতাড়ি ওপরে পালায়।

'তোর কী মনে হয় ?'— চায়ে চুমুক দিয়ে কাজল বলল।

'এটা ধরা পড়ে যাওয়ার রাগ, আবার কী ?'

'কিন্তু আমরাই তো সর্বসমক্ষে বাজি ধরেছি। সবাই তো সবাইকে ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছি। রেস্তোরাঁর বিল চেয়েছি। সিনেমার টিকিট চেয়েছি। ধরা পড়ে

যাওয়ার কোনও কোয়েশ্চন নেই।'

'ঠিকই তো।' আমি বলি, 'কিন্তু ভেবে দ্যাখ কাজলা এই যে অবজেকটিভ কোরিলেটিভটা গোলমেলে মনে হচ্ছে তারই জন্যে অন্তত মালবিকাদির এই হামবড়াইকে ডিকনস্ট্রাক্ট করা দরকার।'

'মানে ? পাশ করেছিস তো ফিলসফি নিয়ে। অতশত লিটর‍্যারি জার্গন হাঁকড়াচ্ছিস কেন ? আমি তোর বিদ্যে জানি না মনে করেছিস ?'— কাজল একেবারে মারমুখী। বাংলার মাস্টারমশাইয়ের বউ বলে ও আমাদের মধ্যে একটা বিশেষ গুরুস্থান দাবি করে থাকে— এ অধিকার ও সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না।

আমি বলি— 'ব্যাপার যত গভীর, ততই তোকে ফিলসফিতে যেতে হবে বুঝলি !'

'ফিলসফি তা হলে হল গিয়ে ডুবুরির পোশাক ?'

'তা সে যাই হোক, আমার ওপর গুরুগিরি না করে আগে সব ভেঙে ফেল, ভেঙে ফ্যাল।'

'যা বাবা ! কী ভাঙব ? এই চারটি বেতের চেয়ার আর ওই একটি ফুলদানি তো আমার সম্বল।'

'উফফ।' আমি আরও অধৈর্য, আরও গভীর গলায় বলি— 'মালবিকাদির কথাবার্তা, ব্যবহার সব ভেঙে ফ্যাল। ভেঙে ভেঙে ভেতর থেকে বিপরীত মানে টেনে টেনে বার কর।'

'যেমন।'

'যেমন— "তুই।" '

'যাব্বাবা যেমন "আমি" ?'

'দ্যাখ আমি বলি— 'মণ্টুর মাস্টারে'র মণ্টুর মতো করিসনি। যথেষ্ট বয়স হয়েছে।'

'আর কত হেঁয়ালি করবি ? মণ্টুর মাস্টারটা কে ? মণ্টুই বা কে ?'

'শিব্রামের মণ্টুকে মনে নেই ? মাস্টারমশাইদের ঘায়েল করে ছেড়ে দিত ? সেই মণ্টুকে টিউটর শেখালেন "আই" মানে "আমি", শিখেছ ? মণ্টু বলল শিখেছি মাস্টারমশাই "আই" মানে মাস্টারমশাই।'

'ওঃ হো, মনে পড়েছে, তার পরে সেই ছারপোকা ?'

'মনে পড়েছে তা হলে ? আমি থেকে মালবিকাদির "তুই" ব্যবহার বিশ্লেষণ করতে বলছি।'

'ও হো হো, শুভমকে "তুই" বলছিল, না ?

'ধরতে পেরেছিস ? এখন এটা একটা আই-ওয়শ কি না বল। প্রথমে বল— তুই দিয়ে প্রেম হয় ?'

'কেন হবে না ?' কাজলা বলল— 'আমাদের সময়ে বাংলা অনার্সকে তো আমরা বৃন্দাবন গার্ডনস বলতুম। মনে নেই। কলেজে দোলখেলা প্রথমে

ওরাই শুরু করে, তা জানিস ? তুই-ই তো বলতো সবাই সবাইকে। তার থেকেই তো দোলা আর সমীরের প্রেম বিয়ে পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ওটা কোনও ব্যাপার নয়। আর আজকাল তো আকছার হচ্ছে। যেন এক ঢং।'

'কেমন একটা ছোটভাই, পিঠ-চাপড়ানো পিঠ-চাপড়ানো ভাব দেখাচ্ছিল না ?'

'ছোটভাই না আরও কিছু ! ভেড়ু। মালবিকাদি আঙুল দিয়ে ভদ্রমহিলার পিঠে খোঁচা মারতে বলল। সেও অমনি। বোগাস। মালবিকাদি শ্রীমতী কামাখ্যা এবং শুভম— শ্রীমান ভেড়ু।'

'আচ্ছা আমরা এত রেগে যাচ্ছি কেন বল তো কাজলা। সত্যিই তো এই রকমই তো কনট্রাক্ট ছিল আমাদের ?'

'হোক না কন্ট্র্যাক্ট ? সেই সঙ্গে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংও ছিল আমরা সবাই ভদ্রলোক। স্টাডি করতে হলে ফিসফিস করতে হবে ? এই তো চন্দন আমাকে কত গাড়ি চড়াল, কত খাওয়ালো, একটা বালুচরি পর্যন্ত কিনে দিল, কেউ বলতে পারবে দিনের পর দিন উধাও হয়ে দুজনে মুখোমুখি হয়ে ফিসফিস করেছি। এই ধর না কেন তুই। ন দশ দিন তো থেকে এলি এক বাড়িতে, একদিনও কি একা একা শালবনে গিয়েছিলি ? একদিনও কি একা একা বসে তার মুখে জীবনানন্দ শুনেছিস ?— মালবিকাদিরটা সাবোতাজ।'

আমি ক্ষীণ স্বরে বললুম— 'তাই ?'

খুব মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

রঞ্জনা অন্তরীণ

'বউদি বিধুভূষণবাবু এয়েছিলেন কিন্তু'— দরজা খুলে দিয়েই শেফালিবাবু অভ্যর্থনা করলেন।

'বাড়িতে ঢুকতে দেবে তো ? না কী ?'

'না বললে, তুমিই বলবে বলোনি কেন সময়মতো।'

'মা, আমার হাত ভেঙে গেছে ?' শান্ত স্লিং-এ ঝোলানো হাত নিয়ে আনন্দে প্রায় লাফাতে লাফাতে বলল।

'সে কী ? কী করে ?'

'বাস্কেট বল খেলতে গিয়ে, সেন্ট টমাসের সঙ্গে টুর্নামেন্ট ছিল ...'

'কে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল ? এক্স রে হয়েছে ? কোন ডাক্তার ?'

'স্কুল থেকে মা। বাড়িতে ফোন করে তোমায় পায়নি তো ! বাবাকে আপিসে ফোন করেছিল, বাবাও সিটে ছিল না। ওরাই নিয়ে গেল, এক্স রে করতে যা লেগেছে না, উরিব্বাস।'

'তা এখন এত লাফাচ্ছ কেন ? এখন কি লাগছে না ? লাফাবার মতো কী হয়েছে ? চুপ করে বসো গে।'— শেফালির দিকে ফিরে বললাম— 'এ কথাটা

চেপে গিয়েছিলে কেন ?'

'বাপ্‌রে, দরজার গোড়ায় কখনও খারাপ খবর দিতে হয় ? বউদি তুমি না মানতে পারো, আমি বাপু স-ব মানি। বিধুবাবু তো আমাদের লক্ষ্মী গো ! ভাল খবরটা তাই আগেই দিলুম।'

সিঁড়ির মোড় থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল— 'আড্ডা শেষ হল ?'

'শেষ আর হল কই ? এ একটা সিরিয়্যাল ব্যাপার। ক্রমশ ক্রমশ ক্রমশ ...'

'তাই তো দেখছি। একটা বিপদের সময়ে বাড়িতে লোকে ডেকে পায় না। ছেলের এক্সরে, ছেলের হাড় সেট, ছেলের ডাক্তারপাতি করবে অন্য লোক, হ্যাঁ ?'

'গৃহবধূ না হয় সুযোগ পেয়ে এক আধ দিন আড্ডা মারে। কিন্তু ইউনিভার্সিটির কর্মী কেন সিটে থাকে না ? ইউনিভার্সিটির আপিসটা কি মামার বাড়ি ? গৃহবধূ না হয় দিন দশেক গৃহ চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে বেড়াতে যায়, গৃহকর্তাই বা কেন একমাত্র সন্তানকে ফেলে বান্ধবী নিয়ে সিনেমা, রেস্তোরাঁ করে বেড়ায় ?'

শেষের কথাগুলোর টাইমিং আমার হল অদ্ভুত। নীচে শেফালি সবে অদর্শন হয়েছে, তার পেছন পেছন শান্ত। শেষের জন ধরেই নিয়েছে হাত যখন ভেঙেছে তখন ক'দিন সাতখুন মাপ, অর্থাৎ লেখাপড়া, স্কুল-যাওয়া এবং সেই সঙ্গে সরীসৃপের পাঁচটি পা-ও তদ্দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে, অর্থাৎ যা খুশি আবদার করা যাবে। এখন সম্ভবত কোনও আবদারের পশ্চাদধাবন করতেই শেফালির পেছন পেছন হাওয়া হয়েছে। ঠিক তখন আমার গলাও সুন্দর উঠছিল নামছিল, প্রফেশন্যাল শ্রুতিনটরা আমার কাছ থেকে শিখে যেতে পারেন। ধরুন ঊর্মিমালা, ব্রততী ...। আর সব চেয়ে যেটা আশ্চর্যের সেটা হল গোটা ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ অচেষ্টাসম্ভব, বেরিয়ে এল বিনা আয়াসে, কোনও চিন্তা ছাড়া। সহজাত প্রতিভাবলে, যে প্রতিভার সম্পর্কে আমি নিজেই অবহিত ছিলাম না।

সিঁড়ির মোড়ে একটি হকচকানো মনুষ্যমূর্তিকে পেছনে ফেলে আমি আমার নিজের নিজস্ব ঘরটি আশ্রয় করি। এবং ভাবতে থাকি শান্তর কেসটা কী ? হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার ? না ডিসলোকেশন, না আর একটু সিরিয়াস ? এক্স রে প্লেটটা দেখলেই নিশ্চয় জানা যাবে, জিজ্ঞেস করলেও, কিন্তু ঠিক এই সময়টায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না, কেন না এখন আমার ভূমিকা হচ্ছে ক্ষুব্ধা, অপমানিতা, খণ্ডিতার।

সবই ঠিক। অভিনয় করছি। কিন্তু এই অভিনয়টা আমি করলাম কেন ? হঠাৎ ? স্বতঃস্ফূর্তভাবে ? তবে কি ভাঙব ? এটাকেও ভেঙে ফেলব ? মালবিকাদির 'তুই' ডাকের মধ্যে যেমন একটা সম্পর্ক গোপন করার, চোখে ধুলো দেবার চালাকি লক্ষ করেছিলুম, আমার হঠাৎ আক্রমণটাও কি তেমন কিছু একটা ঢাকতে ? একটা অপরাধবোধসম্ভূত ? কীসের অপরাধবোধ ? বাড়িতে না

থাকা ? যেটা নিরুপম বলতে চেয়েছিল ? আমার মনে হয় অবজেকটিভ কোরিলেটিভটা আমারও মিলছে না। বাড়ি ফেলে আড্ডা মারার অভিযোগে এতটা তেরিয়া হয়ে যাবার কথা আমার নয়। কোথায় এর শেকড় সুমিতা ? পরের কথাগুলোয় কি সূত্রটা পাব ? শিল্পীর কথা তুলে খোঁচা দিলাম কেন ? কুকুর আমিই লেলিয়ে দিয়েছি ! ইসস শিল্পীকে আমি কুকুরের সঙ্গে তুলনা করছি ? কত ভালবাসি শিল্পীকে। তাকে জিরাফিণী অর্থাৎ একটি তরুণী জিরাফ বলা যায়, কিন্তু কুকুর ? এ কী ? কুকুর কৃষ্ণের জীব তাকে আমি এত খারাপ ভাবছি ? কুকুর তো দেখতেও সুন্দর ! সব কুকুরই তো নেড়িকুত্তা নয়। অ্যালসেশিয়ান আছে, ডালমেশিয়ান আছে, গোল্ডেন রিট্রীভার তো অপূর্ব। স্প্যানিয়েল, স্পিৎজ ঝুলঝুলে, তুলতুলে মিষ্টি নয় ? এক যদি ডবারম্যান বলো তো কেমন বেখাপ্পা দেখতে। আর থ্যাবড়া-নেকো লম্বা-কেনো বুলডগ ? সে-ও তো বেশ মজার ! বুলডগ বলতেই আমার আবার শান্তর মুখটা মনে পড়ল। কেন জানি না। বুলডগের সঙ্গে বেচারা শান্তর কোনও মিল নেই। শুধু বুল-এর সঙ্গে যদি থাকেও, গাঁট্টা-গোঁট্টা তো ! কিন্তু বুলডগের সঙ্গে ? নৈব নৈব চ। কী আশ্চর্য ! বুলডগকেও আমি কোনও ভদ্র সুন্দর মানুষ ছানার সঙ্গে অতুলিতব্য মনে করছি। শান্তকে বেচারি বলছি। মিনিট দশেক পরে দেখলুম নিজেকে বোঝবার চেষ্টায় আমি একটি সম্পূর্ণ হতভম্ব বিভ্রান্ত জীবে পরিণত হয়েছি। ঘরটা যেন আমার অবিরল প্রচেষ্টায় কেমন গরম হয়ে উঠেছে। এখান থেকে আমার পালানো দরকার।

তাড়াতাড়ি মুখ-টুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় বদলে আমি নীচে শান্তর খোঁজে যাই। শান্ত যেখানে তার বাবাও সেখানে। সত্যিই শান্ত এবং শিষ্ট হয়ে সে বাবার সঙ্গে গল্প করছে বসে বসে।

'কীভাবে পড়লে, তারপর কী কী হল আমাকে বল এবার'— আমি বেশ গুছিয়ে বসলাম।

'সেন্ট টমাসের একটা দারুণ লম্বা শিখ ছেলে আমাকে ক্লীন লেগি মেরেছিল মা। পড়েছি বলটা ন্যাটা রতনকে পাস করে দিয়ে একেবারে কনুই মুড়ে।'

'মুড়মুড়িয়ে ভেঙে গেছে ? না কী ?'

'এক্স রে রিপোর্ট তো কাল পাওয়া যাবে, আপাতত ডাক্তারবাবু এই রকমভাবে রাখতে বলেছেন। একটু এদিক-ওদিক হলেই ভীষণ লাগছে মা।'— মুখটা বিকৃত করল শান্ত।

'খেলাধুলো করতে হলে অমন একটু-আধটু হয়, কিন্তু এবার থেকে সাবধান হবে। পরীক্ষা এগিয়ে আসছে না ?'

শান্তর মুখটা ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছে। এতক্ষণ বেশ চলছিল, পরীক্ষাটা আবার কোথা থেকে এসে পড়ল ? এবার পড়ার বিষয়গুলোও না পরপর এসে পড়ে, সেই জন্যে ও বাবা-মার সঙ্গে গুলতানির লোভ ছেড়ে হঠাৎ ... 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেল।

খুব গম্ভীর মুখে কী একটা বই পড়ছে নিরুপম। সাধারণত ও এ সময়টা প্রচুর পত্র-পত্রিকা নিয়ে বসে। একই খবর পাঁচটা কাগজে পড়বে। আজ হাতে বই নিয়ে শান্তর সঙ্গে গল্প করছিল। শান্ত চলে যেতে বইটা তুলে নিয়েছে। অর্থাৎ আমার সঙ্গে কথা বলবে না। না বলুক। আমার তো কিছু হয়নি। সুতরাং আমি বসে আছি।

এত রাগই বা কীসের ? অন্যায়ভাবে আমাকে আক্রমণ করেছিল তার সমুচিত জবাব আমি দিয়েছি। দিয়েছি ছেলে এবং কাজের মেয়ের কান বাঁচিয়ে। তাতে আবার এত রাগ কীসের ? সত্যি কথা বলেছি— তাই ? সিটে থাকো না কেন ? সিটে না থাকাটাই যেন পলিটিকস-বাজদের নিয়ম। আর যে করে করুক, আমার নিজের বর আর সব্বাইয়ের মতো অন্যায্য কাজ করলে আমি বলতে পাব না ? বেশ করেছি বলেছি। বারো মাস তিরিশ দিন আমি বাড়িতেই থাকি। বাড়িতে বসে বসেই দু পয়সা রোজগার করি। এই যদি আমাকে আপিস বেরোতে হত ? তা হলে ? তা হলে তো ফট করে আড্ডার খোঁটাটা দিতে পারতে না নিরুপম চন্দর। আমি ঘর সামলাব, ছেলের স্কুল থেকে হঠাৎ তলব এলে, ছেলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আজকের এই অসম্ভবের যুগে কোথায় হাসপাতাল রে, নার্সিংহোম রে, ডাক্তার রে— সকলই সামলাব, গপ্পো আর রম্যরচনা লিখে লিখে সংসারের সাশ্রয় করব। আর তুমি সিটে থাকবে না। তুমি গরম গরম বক্তৃতা হাঁকড়াবে। আর বউয়ের স্লিম বন্ধুর সঙ্গে ...। জেনে রেখো নিরুপম চন্দর গড়াই, গপ্পো লেখা খুব সোজা কাজ নয়। তার জন্য, ঘোরাঘুরি লাগে, তুমি ভাবো ঘোরাঘুরি মানে শুধু বিধুভূষণবাবুর দোকানে পর্যন্ত যাওয়া-আসা। তাই নয় ? কিন্তু না, আরও অনেক ঘোরাঘুরি করতে হয়। ফডহিস লেন, কীভাবে সার্পেন টাইন লেনে পড়েছে এবং কীভাবে সার্পেনটাইন ডিকসন লেন থেকে সার্কুলার রোডে পড়া যায়, জায়গাটা কেমন জানার জন্যে আমায় ওই চত্বরে পাক খেতে হয়েছিল। রিকশা নিয়ে এক দিন পুরো রামবাগান ঘুরে এসেছি, তা জানো ? এখন ওখানে রামকৃষ্ণ মিশন বেতের কাজ শেখাচ্ছে তা কি জানতে ? জানো কি এসপ্লানেডের কাছে যেমন ধর্মতলা আছে, শালকেতেও তেমন এক ধর্মতলা আছে, কিন্তু তার পাশে কোনও এসপ্লানেড নেই, খোলা ড্রেনে জৈব সারের চাষ আছে। তুমি মনে করো শুধু ক'জন মধ্যবিত্ত গিন্নিই আমার বন্ধু, তাদের সঙ্গে পি এন পি সি করাই আমার অবসরকালীন প্রমোদ। কিন্তু জানো কি আড্ডা মারতে গিয়ে আমি তাদের নড়াচড়া, কথা বলার ঢং, তাদের মতামত এ সবই আমার গল্পের স্বার্থে নোট করে আনি। যে গল্পের দক্ষিণায় তোমাদের দু'-দিনের বাজার তো অন্ততপক্ষে হয়ই। তা ছাড়াও, জানো কিনা জানি না আমি কিছু সোশ্যাল ওয়ার্কস করি। পাড়া বেপাড়ার যত রিকশাওয়ালা সবার সঙ্গে আমার ভাব, গরমের দিনে আমি তাদের শশা খাওয়াই ডাব খাওয়াই, এক পয়সাও ভাড়া কম নেয় না তারা তার জন্যে, শীতের দিনে তোমাদের পুরনো

সোয়েটার, প্যান্ট, শার্ট আমি রিকশাওয়লাদের দিই। যদিও তাদের সেগুলো কখনওই পরতে দেখিনি, শোনা যায় সেগুলো তারা বিক্রি করে তাড়ি খেয়ে নিয়েছে। আর তুমি কী করো ?— সিটে থাকো না। আর শিল্পীর সঙ্গে বেড়াতে যাও। যে শিল্পী তোমার সঙ্গে স্রেফ খেলে।

আবার শিল্পী ? হায় রাম। আমার সব চিন্তা, সব খেদ, সব বক্রোক্তি যে শিল্পী-কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে ? এ কী ? কে যেন বলে উঠল শালবনের কালকোটালে কোনও ভালমানুষের বিবি যায় ?

ভাল করে নিরুপমের দিকে তাকিয়ে দেখি, ও বই হাতে একই রকম কাঠ হয়ে আছে। মনে অপরাধবোধ, সিটে না-থাকার জন্যে ততটা নয়, যতটা জিরাফিনী এক নারীর সঙ্গে আহেলিতে যাবার জন্য। পরিষ্কার বুঝতে পারি। যেন খোলা বইয়ের মতো বিদ্যাসাগরমশাইয়ের বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগের মতো আমি পড়তে পারছি আমার বরকে। এবং এ-ও বুঝতে পারছি শালবন সংক্রান্ত প্রশ্ন আমিই করেছি আমাকে। নিজের সঙ্গে এক নিবিড় কথোপকথনের সুযোগে দমকা উঠে এসেছে প্রশ্নটা।

শিল্পী তো জিরাফ রমণী। গঙ্গপ্রসাদ কী ? কাজলরেখা অবশ্য বলে ভুণ্ডিল মুনি। কিন্তু আমার নিজস্ব একটা ভার্শনও তো থাকা উচিত ! গঙ্গাপ্রসাদ কি এক রকমের শান্ত বাইসন ? যে বাইসনের বাঁকানো শিঙের জায়গায় কড়কড়ে কালো বেশ কুড়মুড়ে চুল। যে বাইসনের চোখে আগুন নেই বরং কেমন একটা উদাস উদাস বাউল-বাউল ভাবের মধ্যে হঠাৎ হাসির ঝিকমিক আছে ! যে বাইসনের লেজের বদলে কাঁচি ধুতির কোঁচা, খুরের বদলে কাবলি, থলথলে গলকম্বলের বদলে ঢোলা খাদির পাঞ্জাবি ? যাঁর ভুঁড়ি আমি মাফ করে দিয়েছি তিনি আমার হৃদয়ের গোলকধাঁধার সংবাদ জানতে পেরেছেন বলে, 'আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা' বেশ অর্থবহভাবে আমায় শুনিয়েছেন বলে ?

ভেঙেছে বাঁ হাত, তা-ও আমি সেদিন শান্তকে খাইয়ে দিলুম। 'ন্ না, ন্ না— আমি পারব'—বলতে বলতে কোমর মোচড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি জোর করতে বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতোই খেল, একটাই অভিযোগ— 'তোমার গরসগুলো কটুকু মা ? আরেকটু বড় করো !'

রাত্রে ছেলেকে নিয়ে শুলামও। হাতের তলায় দুটো কুশন ঠিকঠাক করে রেখে, পিঠের দিকে একটা কুশন দিয়ে যাতে একটু বাঁ কাতে থাকে, আমি চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। আজ আর পড়াশোনা কিছু হবে না। ছেলেটার চোখে আলো লাগবে। গরম, ঘোরাঘুরি এবং আড্ডার ক্লান্তি, সব মিলিয়ে কখন ফটাস করে ঘুমিয়ে পড়েছি।

দেখি হাফশার্ট আর ধুতি পরা উত্তমকুমার একটা কাটা দরজার, মানে সুইং, ডোরের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছেন। উঠোনে কল, কলের তলায় টিনের বালতি। অদূরে ঘরে ওঠবার দাওয়া, সেখানে দড়ি টাঙানো। কোনও সিনেমা দেখছি না, এটা একেবারে বাস্তব। দাওয়ার

ওপরের ঘর থেকে সুচিত্রা সেনের বেরিয়ে আসার কথা কিম্বা সাবিত্রী চাটুজ্জের। কিন্তু বেরিয়ে এলাম আমি। আমি আমাকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমার আমিত্ববোধ ওই দরজা দিয়ে বেরিয়ে, সুইং ডোরে হাত রাখা উত্তমকুমারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। খুব সাধারণ প্রতিদিনের কথা, কী তা আমার মনে থাকল না।

স্বপ্নটা ভাঙবার পর আমি অবাক হয়ে রইলাম। কোনওদিন আমি কোনও নট-নটীকে স্বপ্ন দেখিনি। এঁদের স্বপ্ন দেখা খারাপ বা এঁরা স্বপ্নে দেখার যোগ্য নন তা কিন্তু আমি বলতে চাইছি না। কিন্তু কোনওদিনই তো দেখিনি। যখন উত্তকুমার জীবিত ছিলেন ! তাঁর প্রথম দিকের ছবি 'হারানো সুর', 'শাপমোচন' দেখেছি প্রথম ঘুম-ভাঙা চোখে প্রথম রোম্যান্স ! কই তখনও তো স্বপ্ন দেখিনি ! এখন একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। উত্তমকুমারকে আমরা পছন্দ করতাম ঠিকই। কিন্তু একটু হাসাহাসিও করতাম। উত্তম-ভক্তরা কিছু মনে করবেন না। এ রকম হয়। উত্তমকুমারের মাথার শিঙাড়া বা হুঁ বলে মুখ তুলে তাকানো নিয়ে আমরা এক সময়ে খুব মজা করেছি। সেই শিঙাড়া ভাঙে কিনা দেখবার জন্যেই আমরা 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' দল বেঁধে দেখতে যাই এবং শেষকালে বৃদ্ধ রাইচরণের মসৃণ বিউটি-মাসাজ করা হাত দেখে হাসতে হাসতে বাড়ি-ফিরি। আসলে উত্তমকুমার ছিলেন এক জন বেশ প্রিয়দর্শন মজার মানুষ আমাদের কাছে যাঁকে আমরা কোনওদিন সিরিয়াসলি নিইনি। কোনও সিনেমার অভিনেতাকেই কি নিয়েছি, যেভাবে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, শাঁওলি মিত্রকে নিয়েছি, কুমার রায়, অমর গাঙ্গুলি, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের নিয়েছি ? সিনেমা বোধহয় সত্যিই-সত্যিই রূপোলি পর্দা, রুপো দিয়ে একটা মেকি পৃথিবী বানানো, তাই ভাল লাগে, কিন্তু ওই যে বললাম— সিরিয়াসলি নেওয়া যায় না।

যাই হোক, মোদ্দা কথা বলতে, উত্তমকুমারকে নিয়ে আমার কোনও অবসেশন ছিল না। এ সব অবশ্য নির্জ্ঞান স্তরেও থাকতে পারি। তো থাকলে আমি একটু আশ্চর্য হব, এই। এর চেয়ে বেশি কিছু না। সকাল বেলায় নিরুপমের মুখোমুখি হতে অবশ্য একটু লজ্জা করতে লাগল। ওকে শিল্পীকে নিয়ে সিনেমা দেখার খোঁটা দিয়েছি এদিকে নিজে স্বপ্নে মহানায়ক দেখছি।

চা-পানের সময়েই আগ বাড়িয়ে ভাব করে ফেললুম।

কীরকম আলগা-আলগা হয়ে বসেছিল। জানালুম— 'শান্ত রাতে খুব ভাল ঘুমিয়েছে। একটুও কাতরায়নি। মনে হয় তেমন কিছু হয়নি।'

'এক্স রে রিপোর্টটা কখন পাওয়া যাবে ?' জিজ্ঞেস করি।

'দশটায়।'

'নিয়েই কি ডাক্তারের কাছে যেতে হবে ?'

'ন্যাচর‍্যালি।'

'তা হলে তো আজ তোমার অফিস পাংচার।'

ভুরু দুটো একটু কুঁচকোল। 'অফিস পাংচার' শব্দগুচ্ছ শুনে না এক্স রে-রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবার কথায়, বোঝা গেল না।

'আমার মনে হয় শান্তকে নিয়ে আমরা দুজনেই বেরোই, বুঝলে ?' আমি পরামর্শ দিতে থাকি— 'রিপোর্টটা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাব। যা করবার ডাক্তার করুন। তার পরে আমি ওকে নিয়ে বাড়ি চলে আসব, তুমি অফিস চলে যাবে ?' ভুরু দুটো সোজা হল। অফিস আছে এই তালে পুরো দায়টা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। সেটা ভণ্ডুল হল বলে ভুরুতে ভাঁজ। এখন অর্ধেক বেঁচেছে দেখে জ্ঞানীব্যক্তি বিপদের সময়ে অর্ধেক ত্যাগ করেন এই আপ্তবাক্য মেনে ভুরুর ভাঁজ সোজা করেছে।

এই ভাবেই আমি বেশ কিছুদিন ঘরে আটকে যাই। শান্তর ব্যাপারটা কমপাউন্ড ফ্যাকচার। কবজি থেকে কনুই অবধি প্লাস্টার হয়। তার পরেও স্লিং-এ ঝোলানো। আশা করে নাম শান্ত রাখলেও সে তো আদৌ শান্ত নয়। আমি অহর্নিশি তাকে চোখে চোখে রাখি এবং সেই সুযোগে আমার উপন্যাসও তরতর করে এগিয়ে যায়। প্লট তো ওরা আমাকে দিয়েই রেখেছে। স্টোরি বিল্ডিং-এ একসারসাইজের মতন। এত্তো বড় বড় ফাঁকঅলা। পুট পুট করে কয়েকটা পয়েন্ট-ওয়ালা একখানা প্লট। নাই-ই বা খোঁজ পেলুম সুমিতার। আপাতত সুমিতা, মালবিকাদি এদের কেউ না হলেও চলবে। মাথার মধ্যে থেকে সুমিতা নেমে আসে, মালবিকাদি নেমে আসে। আর আর চরিত্ররাও নেমে আসে। মানে আমি তাদের নামিয়ে দিই। একদিক থেকে আমি তো ঈশ্বরী—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকার আমার হাতে। ইচ্ছে করলেই থই থই শূন্যতার অন্ধকার জলে রূপের আলো ফুটে উঠবে, জেগে উঠবে রক্তাভ সৃষ্টির পদ্ম সহস্র দল মেলে। ইচ্ছে করলেই দিকে দিকে ঘুম ভেঙে উঠে বসবে আদম-ইভরা। তাদের সন্ততিরা দখল নেবে এই পৃথিবীর মাঠে মাঠে ফসল ফলাবে, মেষ চরাবে, পত্তন করবে নতুন নতুন সভ্যতার, হানাহানি করবে, ইচ্ছে করলেই ধ্বংসের কালভৈরবকে নামিয়ে দেব— তা তা থই থই তা তা থই থই তাতা থইথই। এই প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি উদ্ভাবনী শক্তির কাছে একটা সুমিতা একটা শুভম, একটা মালবিকা কিংবা বিকাশকান্তি তো তুচ্ছ ব্যাপার। আমি আমার অদৃশ্য যাদুচক্রটাকে আঙুলের মাথায় বাঁইবাঁই করে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিই। ছুঁড়ে দিই। যা চাকা, খুঁজে নিয়ে আয় পুত্তলীগুলোকে। আমার নিজস্ব এক্স রে আমি তাক করি, যা রে যা বস্তুপৃথিবীর জড় পুঁটলিটাকে ফুটো করে ঢুকে যা দেখা সেই কল্পলোক।

বিকাশকান্তি সান্যাল

এ নব ও নব ঘুরিয়ে যন্তরটার ফোকাস ঠিক করি। আসছে, আসছে, ফ্রেমের মধ্যে এসে যাচ্ছে, যাচ্ছে নয় যাচ্ছেন একজন ভদ্রলোক, ঘিয়ে রঙের

টি-শার্ট পরা। স্পঞ্জের মতো কাপড়টা। পকেটের ওপর ছোট্ট একটা মোটিফ যেন, ওই একই রঙের, সামান্য গাঢ় হতে পারে। চুলগুলো রুপোর তাজের মতো মাথার ওপর শোভা পাচ্ছে। বেশ চৌকো চওড়া মুখটি। ঘন ভুরু, কিন্তু ঝোপের মতন নয়। কপালে গুনে গুনে দুটি আড়াআড়ি দাগ, তাতে একটা ব্যক্তিত্ব, একটা চরিত্র দিয়েছে ভদ্রলোককে। নাকটা খাড়া কিন্তু পাতলা নয়, খানিকটা মোটা, ফটো-ক্রোম্যাটিক লেনসের চশমা পরা, লেনসটা ভারী, মুখের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। ঠোঁট দুটোও বেশ পুরু। পাতলা ঠোঁটের পুরুষদের কেমন নিষ্ঠুর দেখায়। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র। কুন্দকে বিষ খাইয়ে, রোহিণীকে বন্দুক দেগে হত্যা করেন। শৈবলিনীকে নরক দেখান। প্রফুল্লকে দিয়ে বাসন মাজান, যা নরক দর্শনের চেয়ে কোনও অংশে কম খারাপ নয়। পুরু বেশ ঢেউওলা ঠোঁটের অধিবাসীরা খুব বর্ণময় ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন। যেমন সমরেশ বসু। যিনি জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য লেখেন, তিনিই গোগোল লেখেন। এক হাতে কালকূট, "কোথায় পাব তারে"র অন্বেষু বাউল আর এক হাতে শেকল ছেঁড়া হাত খুঁজে চলেছেন। ভদ্রলোক আনকোয়ালিফায়েড ডার্ক।

এই যে কালো তার দেখছি একটা আলাদা মহিমা। যতই দিন যাচ্ছে ততই আমি কেন যেন কালোর ভক্ত হয়ে পড়ছি। কৃষ্ণ কালো, কদম কালো ... আমাদের যে ঐতিহাসিক পৌরাণিক প্রেমিক পুরুষ তিনি স্বয়ংই তো কালো। বর্ষার পুঞ্জ মেঘ, দেখো সেও নীল নবঘন, 'কালো তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার সাদা চুলের ঝোক'— বলেছিল কাজল। বসে আছেন। তবুও বোঝা যায় ভদ্রলোক খুব লম্বা। লম্বা ছাড়া নায়ক হয় না। চয়েস যখন রয়েছে তখন বেঁটে নায়ক বাছব কেন ? বেশি ঢ্যাঙা হয়ে গেলে চোঙা কি বেল বটম প্যান্ট পরলে অড দেখায় যেমন অমিতাভ বচ্চন, ব্যাপারটা ওঁর কোনও বেশকারের মাথায় আসেনি কেন কে জানে। হয়তো ওই অড এফেক্টাই পাবলিক খেয়েছে। তা সে যাই হোক— বিকাশকান্তি বসে আছেন। ফাইলের পাতায় চোখ, পেছনে পাশে কাচের জানালার ভারী পর্দা একটু একটু সরানো, যা দিয়ে লবণহ্রদের চমৎকার সবুজের দীর্ঘশ্বাস দেখা যায়। সামনের টেবিলে দুটো টেলিফোন— একটা সাদা, একটা কালো, কলমদানিতে সার সার বল পেন, অনেক ফাইল গাদা করা, নিবিষ্ট মনে পড়ছেন, টিক মারছেন, সইসাবুদ করছেন ভদ্রলোক, টেলিফোন বাজল, ইন্টারকম। সাদাটা তুলে নিলেন ভদ্রলোক। 'সান্যাল' গম্ভীর গলায় বললেন— এই স্বরটাও খুব জরুরি। স্বর যদি মেঘমন্দ্র না হয় তো তাকে ঠিক প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে ভাবা চলে না— যেমন শচীন তেণ্ডুলকর চিরবালক।

'ও, আচ্ছা, আমি একটু ব্যস্ত, ঠিক আছে, এসেছেন যখন চলে আসুন, আসতে দাও রমেন।'

মিনিট দুই পরে যে ঢুকল তাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। আপনারাও চেনেন, অর্থাৎ নামে জানেন, কিন্তু দেখেননি কখনও। এটি সুমিতা। এবং

বিকাশকান্তির বিপরীতার্থবোধ। সুমিতা ধবধবে ফরসা, বেঁটে না বলে ছোটখাটো বলা ভাল, নায়িকাও আমি দীঘল দীঘল পছন্দ করি, কিন্তু এ যে সত্যি সুমিতা একেবারে মেপে পাঁচ ফুট। বাড়াব কী করে? ঝুমুর ঝুমুর চুলে পেছন থেকে একটা লম্বা চকচকে গুবরে পোকার মতো ক্লিপ দিয়ে আটকানো, প্রসাধনের সমস্ত আধুনিক নিয়ম পালন-করা লিচু-লিচু মুখ, কাজলপরা ম্যাসকারা মাখা চোখে ইচ্ছে করলেই বালিকার বিস্ময় ফোটাতে পারে, আবার খুব চালাক-চালাক পাজির-পা-ঝাড়া খুনসুটে মেজাজ ফোটাতেও ওর জুড়ি নেই। বেশ টেবো টেবো গাল, দেখলেই টিপে দিতে ইচ্ছে করবে আপনার। ঠোঁটও বেশ ফুলো ফুলো, যেন এক্ষুনি ঠোঁট ফুলোবে, এই সব ভাব— অর্থাৎ আদুরি, পাজি, চালাক অভিমানী, মজাদার—এ সব সুমিতা নিজের মুখে তুলি দিয়ে আঁকতে পারে। অ্যাক্টিং লাইনে গেলে অনেকের ভাত মারতে পারত।

সুমিতা আজকে একটা হালকা চাঁপা রঙের টাঙাইল শাড়ি পরেছে। তাতে সাদার গোল গোল বুটি। ব্লাউজটাও একেবারে এক রঙের। গলায় চিকচিকে সরু সোনার হার, কানে সোনার বুটি, হাতেও ঝিকমিকে সোনার চুড়ি, গুনে তিনগাছা। যেন জরির সুতোর মতো জড়িয়ে আছে। ঢুকেই সুমিতা একটা হাসি দিল। আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল, কিন্তু খুব সংযত সংহত হাসি, হাসিটা বোধহয় ওজন দাঁড়িতে মেপে এনেছে।

বিকাশকান্তি বললেন— 'বসুন। তারপর?'

শিল্পী হলে বলত— 'তার আর পর নেই।' ওই একটা জবাবই ওর ঠোঁটের গোড়ায় রেডি। কিন্তু সুমিতা অত কাঁচা খেলোয়াড় নয়। সে একটা সুদৃশ্য ফাইল বার করে ফেলে। বলে— 'প্রজেক্টের সিনপসিসটা আজ দেখবেন? বিকাশকান্তি বলেন— 'সিনপসিস দেখার কি আমার সময় আছে ম্যাডাম? আপনি মোটামুটি মেইন পয়েন্টগুলো বলে দিন।'

'হাই ইনকাম-গ্রুপের চাকুরেদের, মাইন্ড ইউ সার ব্যবসায়ী নয়, স্যালারিড পার্সনস— এঁদের স্টাডি করছি মোটামুটি। একটা কোয়েশ্চনেয়ার তৈরি করেছি— আপনাকে দিয়ে যাব, আপনি কাইন্ডলি জবাবগুলো দিয়ে দেবেন। বেশির ভাগই ইয়েস, নো কিম্বা চয়েস। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

অল্প একটু হাসি দেখা গেল বিকাশকান্তির মুখে— "আপনি পেপার তৈরি করছেন খুব ভাল, কিন্তু একটা ইয়ংগার এজ-গ্রুপ নিয়ে করলে পারতেন না?'

'দেখুন সার, এখন এঞ্জিনিয়ার ছাড়া অন্য সবার চাকরি পেতে পেতেই আটাশ উনত্রিশ হয়ে যাচ্ছে। বছর চল্লিশের আগে কেউ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ভাবতেই পারছে না। আমি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ রেখেছি এজ-গ্রুপ।'

'তা হলে হয়েই গেল, আ অ্যাম অন দা রং সাইড অফ ফিফটি।' বিস্ময়ের চোখটা এবার করল সুমিতা।

'এতো অবাক হচ্ছেন কেন? আমার মাথার দিকে চাইলেই তো বোঝা যায়!'

'ইউ মীন ইট ইজ ন্যাচর‍্যাল?'

'তার মানে?'

'প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, আমি ভেবেছিলাম আপনি আজকালকার ফ্যাশন অনুযায়ী চুল রুপোলি ডাই করেছেন।'

'চুল আবার রুপোলি ডাই করা যায় না কি? ইটস নিউজ টু মী।'

'এই তো আমার একটা প্রশ্নের জবাব আপনি এক রকম দিয়েই দিলেন। সাত নম্বর প্রশ্নটা দেখবেন।'

'দেখে আর কী করব, আমি তো আপনার আওতার বাইরে চলে গেলাম।'

'কেউ বিশ্বাস করবে না মি. সান্যাল, কিন্তু আপনি যখন বলছেন— বিশ্বাস করছি। আমি আমার আওতাটাকে বাড়িয়ে নেব এখন। অসুবিধে নেই। ইনকাম গ্রুপটা জরুরি, এজটা নয়। — আচ্ছা আজ চলি।'

হাতজোড় করে সুমিতা উঠে দাঁড়ায়।

'শুনুন শুনুন।' ব্যস্ত হয়ে সান্যাল বলে ওঠেন— 'আসল কথা আমার এত পেন্ডিং কাজ পড়ে আছে। বাড়িতেও ফাইল নিয়ে যেতে হচ্ছে রোজ। কখন আপনার প্রশ্নপত্র পড়ব?'

'এই কথা?' সুমিতা এবার খুব সিরিয়াস মুখ করে, 'আচ্ছা ধরুন, এ সমস্যাটির সমাধান যদি আমি করে দিই।'

'আমার সময় সমস্যার সমাধান আপনি করবেন?'

'সাইকলজির লোক তো আমি।'— এ বার সুমিতা তার সবচেয়ে মুগ্ধকর হাসিটা হাসে।'

'সাইকলজির লোকেরা টাইমও বার করতে পারে?'

'সাইকলজির লোকেরা অনেক কিছুই বার করতে পারে টেনে টেনে।' সুমিতা জবাব দেয়, 'আচ্ছা, অফিসের পর আপনি কী করেন?'

'অফিসের পর?'— হো হো করে হেসে ওঠেন বিকাশকান্তি।' ওই সময়টাকেই আপনি ধরবেন সমস্যার সমাধান করতে? এই আপনার সাইকলজি?'

আমার সাইকলজি ঠিকই আছে। আপনি বলুন না কী করেন?'

'একটু রিল্যাক্স করি, আর কী করব? যতক্ষণ না জ্যামটা কাটে— একটু স্ট্যান্ড ধরে হাওয়া খাই। ধরুন, ফোর্ট উইলিয়মের এন্ডটায় বসলাম, কি সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ দিয়ে এক পাক ড্রাইভ করলাম। তারপর বাড়ি ফিরে যাই।'

গাম্ভীর্যের খোলস খুলে বিকাশকান্তি ব্যক্তিগত জীবনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকেন।

সুমিতা খুব কিন্তু কিন্তু করে বলে— 'ওই রিল্যাক্সেশনের সময়টা আমি যদি দু-চারদিন একটু থাকি আপনার সঙ্গে, আপনার কি খুব আপত্তি হবে? আপনার বিশ্রামের আমি ব্যাঘাত করব না, বরং রিল্যাকসেশনের কতগুলো উপায়

আপনাকে শিখিয়ে দেব। আসলে সাইকলজির লোক তো!'— সুমিতা হাসে।

'ঠিক আছে, এক দিন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা যেতে পারে।' ফাদার জেনকিন্‌সের ভাষায় বিকাশকান্তি ভাঙ্গেন তবু মুচকেন না।

'মেনি থ্যাংকস,' বিব্রত মুখে সুমিতা বলে, 'আপনাকে খুব বিরক্ত করছি আমি জানি, কিন্তু এটা ফোর্ড ফাউন্ডেশনের একটা গ্রান্ট থেকে হচ্ছে। ফাঁকি দিয়ে সারা যায় ? বলুন !'

আর বিরক্ত করে না তাঁকে সুমিতা। মুহূর্তে ফম্যালিটির মোড়কে মুড়ে যায়। প্রফেশন্যাল গলায় বলে— 'নমস্কার, থ্যাংকস।'

'তা হলে কাল পাঁচটার সময়ে আসুন'— বিকাশকান্তিই পিছু ডেকে তাকে মনে করিয়ে দ্যান।

'এইখানে ? এত দূরে ? তার চাইতে আপনি বাই-পাসে পড়ে পার্ক সার্কাস কানেক্টরের ওখানে আসুন। আমি দাঁড়িয়ে থাকব। সাড়ে পাঁচ। ঠিক আছে।' বলে তাকে বিদায় দিয়েই বিকাশবাবুর কেমন মন খুঁতখুঁত করতে লাগল, তিনি একটা পাবলিক সেক্টর সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, বয়সও পঞ্চান্ন হল। এই মেয়েটি তাঁকে যে পরিস্থিতিতে ফেলে গেল তাতে করে তাঁকে অফিসের পর অনেকটা রাস্তা গিয়ে একটি প্রতীক্ষমাণা মহিলা, না না তাঁর স্ত্রী মহিলা। কিন্তু এ মেয়েটি নেহাতই মেয়ে, যাই হোক, প্রতীক্ষমাণা মেয়েকে মিট করতে হবে।

'ইডিয়টিক !' বলে তিনি ড্রয়ারটা শব্দ করে বন্ধ করলেন। কিন্তু বলা কথা আর ছোঁড়া তীর ফিরিয়ে নেওয়া কি যায় ?

বাড়ি ফিরে মালবিকার সঙ্গে একটু পরামর্শ করলে হত। কত রকম বিপদ হয়েছে আজকাল। মেয়েটি কোনও দলের হয়ে কাজ করছে না তো ? তাঁকে কোনও রকম বেকায়দায় ফেলবে না কি ? কিন্তু মালবিকাকে কি আর সন্ধেবেলায় বাড়ি পাওয়া যায় ! মহিলা সমিতির নাম করে মহিলা অষ্টপ্রহর সংকীর্তন করে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে তাকে পাওয়াই যায় না। একটা ছেলেমেয়েও যদি থাকত এতটা বাড় বাড়ত না। এখন তাকে হ্যা হ্যা করে চব্বিশ ঘণ্টা হাসতে আর পান চিবোতে বাধা দিচ্ছে কে ? চ্যাটাং চ্যাটাং করে চটি পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গেলেই হল। বাড়ি ফিরে চান-টান করে টিভিটা চালিয়ে দিয়ে একটু আলগা হলেন সান্যাল। প্রত্যেক চ্যানেলে একই নাচ দেখাচ্ছে— শখানেক মাথায় ফেট্টি বাঁধা খালি গা ধুতি মালকোচা পরা ছোকরা আর ডজন দুয়েক লিকপিকে মেয়ে নিজেদের দশ ডবল সাইজের ঘাঘরা পরে নাচছে। কিছুক্ষণ দেখতে দেখতে মেয়েগুলোর জন্যে বড্ড দুঃখু হল বিকাশকান্তির। আহা খেতে পায় না। টাকার অভাবের জন্যে নয়। এই নাচ নাচবার জন্যে, স্রেফ মিনার‍্যাল ওয়াটার আর আপেল খেয়ে থাকে বোধ হয়। ছোকরাগুলোর কিন্তু মজা খুব, যত তাগড়া হবে ততই ভাল, সুতরাং খেয়ে যাও

আর মুগুর ভেঁজে যাও, খেয়ে যাও আর মুগুর ভেঁজে যাও। তাঁর বাবার মতো। মেয়েদের এক্সপ্লয়েট করবার কত পদ্ধতিই না বার করেছে পৃথিবী। তিনি এক্সপ্লয়টেড হতে যাচ্ছেন না তো কোনওভাবে। আচ্ছা, মেয়েটি তাঁকে একটা কার্ড দিয়েছিল না ? খুঁজে পেতে ব্রীফ কেস থেকে কার্ডটা বার করেন বিকাশকান্তি।

সুমিতা সরকার—এম এসসি, এম.ফিল, পিএইচ ডি
রীডার ইন সাইকলজি
অমুক কলেজ,
সাইকো-অ্যানালিস্ট
ফোন— চেম্বার .. এত
রেসিডেন্ট— এত।

আচ্ছা, এটা তো অনায়াসেই ভেরিফাই করে নেওয়া যায়। আচ্ছা, এই কলেজের প্রিন্সিপ্যালই তো অশোক লাহিড়ী। তাঁর বন্ধু দীপক ভাদুড়ির ভায়রা। অবিলম্বে দীপককে ফোন করেন বিকাশকান্তি।

'আরে দীপক, আছিস কেমন ? করছিস কী ?'

'কী আর করব, খাতার পাহাড় সবে হালকা হতে শুরু করেছে, একটু টিভি দেখছি।'

'পারছিস দেখতে ?'

'আরে বুঝলে না, মাথা ভোঁতা হয়ে গেছে এখন, একটা ঠ্যালাওয়ালাও যা এক জন দীপক ভাদুড়িও এখন তাই।'

'আচ্ছা দীপক তোমার ভায়রা যেন কোন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ?' নাম বলেন দীপক।

'ভদ্রলোককে আমার একটু দরকার ছিল।'

'হঠাৎ ?'

'একটা ইনফর্মেশন নিতাম।'

'কলেজ-সংক্রান্ত কিছু ?'

'ধরো তাই।'

'ধরতে হবে কেন ? অ্যাডমিশন ? পোস্ট খালি ? রেজাল্ট ?'

নাঃ দীপকটা ছাড়বে না।

'পোস্টের কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম। ওদের কলেজে সাইকলজি আছে ?'

'হ্যাঁ অ্যাঁ।'

'পোস্ট খালি আছে কোনও ?'

'আমি তো যদ্দুর জানি, না। নরনারায়ণ পাণ্ডে, সীতা মহলানবিশ, সুমিত্রা সরকার, স্পর্শমণি ধিংড়া।'

বাস আর শোনার দরকার নেই বিকাশকান্তির। কাজ হয়ে গেছে। বলেন—'নেই তা হলে ? আমার এক আত্মীয়র মেয়ে চাকরি চায়।'

'চাকরি চায় তো কলেজ সার্ভিস কমিশনের বিজ্ঞাপনের জবাব দিতে বলো। এমনি এমনি কি আর এ সব চাকরি হয় আজকাল ? নেট, স্লেট-এ বসতে বলো—এমপ্যানেলড হোক, আর যদি ওদের ফিফথ পোস্ট হয়ে থাকে তো বলে দেখতে পারি। কী নাম মেয়েটির ?'

ফোনটা কেটে দিলেন বিকাশকান্তি। আর-একটু হলেই সুমিতা সরকার বলে ফেলেছিলেন।

তা তো হল। কিন্তু এই সুমিতাই এই সুমিতা কি না, কী করে জানা যাবে ? এ প্রশ্নটা বিকাশকান্তির মনে এল আরও একটু পরে। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে আপ্তবাক্যটি যে কতটা সত্যি তাই ভেবে বিকাশ হাত পা কামড়ান। আচ্ছা, কার্ডে দেওয়া ফোন নম্বরগুলো ট্রাই করলে কেমন হয়!

প্রথমে চেম্বারেরটা করলেন তিনি। বেজেই যায়, বেজেই যায়। তারপর এক জন খুব ক্যাঁটকেঁটে গলার মহিলা বললেন—'কাকে চাই ? সুমিতা সরকার ? সে তো শুধু মঙ্গলবার বসে।' সে কী ? কালই তো মঙ্গলবার! যদি চেম্বারেই বসবে তো সুমিতা আসে কী করে ? এইবার ধরেছি—এই মেজাজ নিয়ে তিনি বললেন—'আচ্ছা ম্যাডাম, ইনি কোন সুমিতা সরকার বলুন তো ? কালো করে মোটা করে...'

'ম্যাডান ট্যাডান নয় বাছা, আমি কালীপদর মা। ও মেয়ে খুব ধিঙ্গি, তবে কালো মোটা বললে মিথ্যে বলা হবে। মেমের পারা গোরা। বে হয়ে গেছে কিন্তু।'

মহিলা ফোন রেখে দ্যান।

আশ্চর্য! তাঁর গলা কি পাত্রর বাবার মতো শোনাচ্ছে না কি ? বিকাশবাবু যারপরনাই বিরক্ত হন। তবে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান মোটামুটি। ব্যাপারটা তাঁর মনকে কতখানি অধিকার করে রেখেছে সেটা বোঝা যায় যখন খাবার টেবিলে বসে দু' হাতে রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে তিনি বলেন—'মেয়েটা জেনুইনই।'

'কে জেনুইন ?' মালবিকা অবাক হয়ে বলেন।

'ও সে একটা কেস!' অন্যমনস্ক হয়ে বিকাশকান্তি জবাব দ্যান।

'কবে থেকে আবার তুমি ডাক্তার উকিল হলে ?'

'আজ থেকে ?' বলে বিকাশকান্তি বলে উঠলেন, 'উকিল কেন ? ডাক্তার হলেও হতে পারে!'

'তুমিই তো একটি কেস দেখছি' মালবিকা রুটি-মাংস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এখন, এঁরা দু'জনেই বিখ্যাত খাইয়ে ফ্যামিলির সন্তান। খাওয়াটা এঁদের কাছে একটা পবিত্র রিচুয়্যালের মতো। খাবার সময়ে এঁরা দু'জনেই তদ্‌গত হয়ে যান। কাজেই আধঘণ্টার মতো সময় বিকাশকান্তি তাঁর দুশ্চিন্তার ব্যাপারটা একেবারে ভুলে যান। এর পরে অফিস থেকে আনা ফাইলে মনোনিবেশ। এ

সময়ে কোনও দুশ্চিন্তার প্রবেশ নিষেধ।

লাইট অফ্‌ফ। যাঃ। কী অদ্ভুত সভ্য-ভব্য লাজুক লাইট রে বাবা! মালবিকা-বিকাশের বেডরুম-সিনের বেলায়, সময় বুঝে অফ্‌ফ হয়ে গেল ?

স্বপ্নদোষ-ব্যাখ্যা এবং অ্যাডভেঞ্চার

কিন্তু সেই স্বপ্নটা ? স্বপ্নটা আমাকে বড্ড ভাবাচ্ছে। সুমিতার সাহায্য চাই। ও তো একবারে বে-পাত্তা হয়ে আছে। মহানায়ককে আমি হঠাৎ স্বপ্নে দেখতে গেলাম কেন ? এ তো এক ধরনের 'স্বপ্নদোষ'। এগারো-বারো বছর বয়স যখন, তখন স্বভাবতই আমি 'স্বপ্নদোষ' মানে জানতুম না। আরও অনেক বড় বয়সেই কি জেনেছি ? তখন 'স্টেটসম্যান' তার 'ভয়েসেজ' বার করেনি। নতুন কথা, শব্দ, প্রয়োগ না করতে পারলেও শান্তি পাচ্ছি না। আমাদের ছোটবেলায় তো টি.ভি ছিল না। বড্ড শো-বাজ ছিলুম। আট-ন বছর বয়সে দাদা-দিদিদের ইনটেলেকচুয়াল আসরে—অইউং ঋণক হযবরট্ লঙ্...” বলতে বলতে ঢুকে গিয়েছিলুম। ওরা অত কী আলোচনা করে, আমাকে পাত্তা দেয় না, আচ্ছা আমিও দেখাব, এই ভেবে দিদির টেবিলে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ছিল, তার থেকে কিছু মুখস্থ করে নেমে গিয়েছিলাম। তা, সেইরকমই মাকে একদিন বললাম—'মা, আমার রোজ রোজ স্বপ্নদোষ হচ্ছে।' যা ব্বাবা মা খেপে লাল। কোথায় মেয়ের ম্যাচুওরিটি দেখে মুগ্ধ এবং নিশ্চিন্ত হবে!

'ধেড়ে মেয়ে, কখন কী বলতে হয় জানো না।'

মায়েদের সুবিধামতো মেয়েরা একই বয়সে কখনও 'তেলপটকা' কখনও 'ধেড়ে' হয় এ কথা নিশ্চয় সবাই জানেন।

মায়ের কথায় এবং এই মারে তো সেই মারে মূর্তি দেখে মিইয়ে যাই বলি—'বা রে মাকে বলব না তো কাকে বলব!'

'কী হয়েছেটা কী বলো।' —খানিকটা সামলে নিয়ে মা বলেন, 'রোজ দেখছি একটা কে যেন আমার বুকের ওপর বসে, গলা টিপে ধরছে, আমার দমবন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তারপর আঁ আঁ করে জেগে উঠি, আর দিদি আমাকে ঠাঁই ঠাঁই করে মারে।'

মা গম্ভীরভাবে বলেন—'ক'দিন আমার পাশে শোও। পাশ ফিরে শোবে হাত বুকের ওপর রাখবে না, ঠিক হয়ে যাবে। ওকে "স্বপ্নদোষ" বলে না।'

'তা হলে কাকে বলে সেটা বলবে তো ?'

মা মুখ ফিরিয়ে রান্নাঘরে চলে গেলেন। অর্থাৎ বলবেন না। ঠিক যেভাবে প্রফুল্ল মাস্টারমশাইকে 'হস্তমৈথুন' মানে জিজ্ঞেস করাতে তড়িঘড়ি অঙ্কের খাতা কালির শিশি সব উলটে চলে গিয়েছিলেন। দরজার কাছ থেকে ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করেন সেবার, 'কোথায় পেয়েছ ?'

আমি বলি—'পাঁজিতে।'

'পড়ো না।'

বা রে বা! পড়ব না? তিলতত্ত্বটা অত ইমপর্ট্যান্ট। বাঁ পায়ে তিল থাকলে দেশভ্রমণ হয় কোত্থেকে জেনেছি? পাঁজি থেকেই তো? তারপরেই তো মুরাড্ডি চাণ্ডিল সব ঘুরে এলাম! বাঁ ঠোঁটের ওপর তিল থাকলে প্রেমজ বিবাহ হয়, রীণাদির বিয়েতে অত সমালোচনা হল মাস্টারমশাইকে বিয়ে করেছে বলে, তার পর পরই তো আমাদের দুলালদাকে ছাড়িয়ে দিয়ে বুড়ো মাস্টারমশাই প্রফুল্লবাবুকে রাখা হল, তো রীণাদিরও তো বাঁ ঠোঁটে তিল ছিল। পাঁজি আবার পড়ব না!

তা সে যাই হোক প্রফুল্ল মাস্টারমশাই কোনও কোনও প্রশ্নের বেশ সন্তোষজনক উত্তরই দিতেন।

'মাস্টারমশাই, বারবনিতা মানে কী?'

'অ্যাঁ?' মাস্টারমশাই চমকে উঠলেন, তারপর বললেন—'বার মানে কী?'

'বাইরে।'

'আর বনিতা মানে?'

'মেয়ে।'

'তবে?'

'বাইরের মেয়ে।'

'এই তো বুঝেছ।'

ঠিক সেই সময়ে দিদি ঢুকছিল। আমি বললাম, 'মাস্টারমশাই, বারবনিতা এল।'

প্রফুল্ল মাস্টারমশাই এ বার এমন চমকে উঠলেন যেন ভূত দেখেছেন। দিদি গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুকে গেল।

মাস্টারমশাই চলে যেতে ভেতরে ডাক পড়ল। দিদির পড়ার ঘরে। 'কান ধরে এক পায়ে দাঁড়াও।'

'কেন?'

'খারাপ কথা শিখেছ, সেইটা বলছ আমাকে?'

বুঝতে পারি কোথাও একটা খুব ভুল হয়ে গেছে।

'বেশ্যা'র বেলায় আর ভুল করিনি।

এ মানেটাও মাস্টারমশাইকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম।

উনি বলেন—'যে বেশ করে, অর্থাৎ খুব সাজগোজ করে সেই বেশ্যা।'

'যেমন মিতাদি?'—উদাহরণ সহযোগে ছাড়া আমি কিছুই বুঝতে রাজি নই।

'মিতাদি কে?'

'এই তো আমাদের পাশের বাড়ি থাকে। কাজলের জাঠতুতো দিদি। লিপস্টিক রুজ পাউডার মেখে বেরোয়। খুব ঝলমলে শাড়ি পরে...খুব গয়না...'

বাধা দিয়ে মাস্টারমশাই বললেন—'কথাটা নিন্দার্থে ব্যবহার হয়।'

'নিন্দেই তো করে সবাই মিতাদিকে। ময়দার বস্তা বলে, রং মাখা সং বলে।'

'তা বলুক, বেশ্যা বলতে হলে মিতাদিকে আরও অনেক অনেক সাজ করতে হবে, সে কত সাজ তুমি ধারণাই করতে পারবে না। কথাটা বলো না। তা খুকু—কথাগুলো তুমি কোথায় কোথায় পাও? এগুলোও কি পাঁজিতে আছে?'

'না তো সার, পুরনো প্রবাসী ঘেঁটে ঘেঁটে পড়ি তো!'

'তা প্রবাসী ঘেঁটে কি এই সব শব্দ ছাড়া আর কিছু পাও না? অভিধান দেখা অভ্যেস করো, অভিধান দেখো।'

'দেখি তো সার'—আমি বলি—'পনস মানে কাঁটাল, প্রোষিতভর্তৃকা মানে যার স্বামী দূরে থাকেন, পটল মানে আলু-পটলের পটল নয়—অনেক, রোদসী মানে ছিঁচ কাঁদুনি নয়, পৃথিবী, রশনা মানে জিভ নয়, কোমরে পরার গয়না, এ সব তো আমি অভিধান দেখে দেখেই জেনেছি, কিন্তু এগুলো তো বুঝতে পারি না—বারবনিতা মানে দেওয়া আছে বেশ্যা, বেশ্যা মানে বারবনিতা, হস্তমৈথুন মানে হস্তদ্বারা মৈথুন, মৈথুন মানে মিথুনক্রিয়া, কী করে বুঝব?'

তা সে যাই হোক, ছোটবেলা থেকেই আমার খুব কৌতূহল। মা বাবা দাদা দিদি মাস্টারমশাইদের জ্বালিয়েছি কম না। এখন প্রয়োগটা অনেক সংযত হয়ে গেছে, কিন্তু কৌতূহল? কাউকেও আমি ছেড়ে কথা কই না। নিজেকেও না।

সুমিতাদের ফোনটা ট্রাই করি। নাঃ এখনও ঠিক হয়নি। তখন অগত্যা আরও দুটো ফোন করতে হয়। একটা শিল্পীকে।

'শিল্পী, আজ এগারোটার সময়ে তুলতুলকে নিয়ে চলে আয় আমার বাড়ি।'

'আড্ডা বসবে?'

'আজ্ঞে না, শান্ত খুব শিল্পীমাসি শিল্পীমাসি করছে।'

'আর শান্তর বাবা?'

'সে-ও করছে, "মনে মনে"—"মনে মনে"-টুকু আমি সুর করে বলি, "কাবুলিওয়ালা" ছবির মিনির ঢঙে।

'যাঃ,' শিল্পীর রি-অ্যাকশন।

'যাঃ মানেই হ্যাঁঃ,' আমি পরশুরাম কোট করি।

'আমি থাকব না। কোস্ট ক্লিয়ার'—শিল্পীকে প্রলোভিত করি।

'তুমি আবার শান্তিনিকেতনে যাবে?' শিল্পী যেন মার-মার করে ওঠে। নিজের বেলা আঁটিসাঁটি পরের বেলা দাঁত কপাটি।

'যাব, তবে শান্তিনিকেতন নয়, গড়িয়াহাট ছাড়িয়ে, যাদবপুর ছাড়িয়ে'...

'সুমিতাদির কলেজ?'

'এই তো ঠিক ধরেছিস। মাথার গোবর একটুখানি রিপ্লেস্‌ড হয়েছে মনে হচ্ছে? বাই ঘি!'

শিল্পী এ সব বক্রোক্তি পাত্তা দিল না, বলল—'সুমিতাদির ব্যাপারটা তা হলে

ভাল এগিয়েছে বলো ? আমরা ফ্রেঞ্চ পারফিউম পাচ্ছি ?'

'তুমি এসে শান্তকে আগলাও, তার হাত ভেঙেছে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার।'

'বলো কী ? কবে, আগে বলোনি তো !'

'নিজের হ্যাঁপা আমি সাধারণত নিজেই সামলাই।'

'যাচ্ছি। তবে তোমার হলেও-হতে-পারে বউমাকে নিচ্ছি না।'

'কেন ? বাল্যপ্রেমের ভয়ে ?'

'স্কুল থেকে ফিরবেই তো সাড়ে দশটা, তারপর অত ধকল সয় ? ওকে বাবা-মার কাছে রেখে যাচ্ছি।'

শিল্পীর আসাটা নিশ্চিত করে, কাজলকে ডাকাডাকি করি।

কাজল তো এক পায়ে খাড়া।

সুতরাং এগারোটা নাগাদ আমরা সুমিতার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি।

যাত্রাপথের কথা আর কী বলব ? সহযাত্রিণী যেখানে কাজলরেখা মিত্তির সেখানে যাত্রা ঘটনাসঙ্কুল হবে বই কী !

এক মাড়বার গৃহিণীকে কনুইয়ের গোঁত্তা দিয়ে আর-এক পঞ্জাবিনীর পা মাড়িয়ে দিয়ে কন্ডাক্টরের ব্যাগের স্ট্র্যাপ ধরে কাজল বাসে উঠল। এক রোগা বাঙালিনীর প্রায় কোলে বসল, পাশে আর এক তামিলনীকে ঠেলে সরিয়ে এক চিলতে জায়গা করে একগাল হেসে বলল—আয় রঞ্জু, বোস, কুলিয়ে যাবে। বাঙালিনী ও তামিলনী নিজ নিজ ভাষায় প্রবল প্রতিবাদ করলে বলল—'ইনি কে জানেন ? 'সিঁথির সিঁদুরে সিঁদ' সিনেমার লেখিকা, 'আয়নাতদন্ত' বলে যে নতুন ছবিটা আসছে সেটাও এঁর লেখা।' টেনে বসিয়ে দিল আমাকে কাজল। এক একবার ড্রাইভার ব্রেক কষছে আর দু' দিকের চাপে আমি উঠে উঠে পড়ছি। শেষকালে অতিষ্ঠ হয়ে যেই বলেছি—'আমি আর পারছি না উঠে দাঁড়াচ্ছি।' তখন কাজল কী বলল জানেন ?

'ওঠ না ওঠ—সুড়সুড়ি টুসটুড়ি কি খোঁচা মোচা খেলে আমায় বলতে আসিস না। সার সার সব ঝুঁকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।'

এ কথায় বাসে তীব্র প্রতিবাদ হয়। প্রথমটা সকলেই হকচকিয়ে যায়। কিন্তু তারপর এক ভদ্রলোক মরিয়ার মতো বলে ফেলেন—'ভদ্রলোককে যা-তা বলছেন, আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।'

'কাকে বলেছি ?' কাজল সঙ্গে সঙ্গে রেডি।

'আমাদের সব্বাইকে বলেছেন, সব্বাই শুনেছে।'

'শুনেছে সবাই, কিন্তু বলছেন আপনি। ঠাকুরঘরে কে না আমি তো...'

'বাজে কথা বলবেন না, কী দাদা, আপনারা শোনেননি ?'

আর-এক জন বললেন—'যেতে দিন দাদা যেতে দিন। মেয়েছেলের কথা গায়ে মাখলে চলে না।'

ভদ্রলোক বললেন—'আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।'

'আমার লজ্জা আমি বুঝব। কিন্তু আপনাদেরও লজ্জা হওয়া উচিত।'

'আশ্চর্য, আমরা কেন লজ্জা পেতে যাব ?'

'পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করছেন।'

'আপনি ঠেস দিয়ে কথা বলেছেন, তাই প্রতিবাদ করেছি।'

'তা যদি বলেন, তো হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভাঙতে আমাদের বাধ্য করেছেন বলেই আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত।'

'আশ্চর্য তো ! কিছু করিনি অথচ লজ্জা পেতে হবে ?'

'জাতভাইদের জন্যে লজ্জা পেতে হবে বই কী !'

'আশ্চর্য তো !'

'বারবার আশ্চর্য হচ্ছেন কেন ? বাড়িতে গিয়ে বাড়ির মেয়েদের জিজ্ঞেস করে দেখবেন তারপর আশ্চর্য হবেন।'

'আচ্ছা মেয়েছেলে যা হোক বাবা !'

'মেয়েছেলে মেয়েছেলে' করছেন কেন তখন থেকে ? ভদ্রতাও কি আপনাদের বাসের ভেতর স্কুল বসিয়ে শেখাতে হবে ?'

এক জন বলে উঠল—'মহা মুশকিল, মেয়েছেলেকে মেয়েছেলে বলব না তো কি ব্যাটাছেলে বলব ?'

এই কথায় বাসের মধ্যে একটা হাসির হররা উঠল। হররা একটু থামলে মাড়োয়ারিনী হেঁড়ে গলায় বলে উঠলেন—'লেকেন উও যো বোলী সহি বাত বোলী, আপকো সব শরমিন্দা হোনা চাইয়ে। লাজ্জা করুন। তোখন থেকে আট্টা কি তরহ হমাকে ঠেসিয়ে যাচ্ছেন ঠেসিয়ে যাচ্ছেন।'

এক ছোকরা সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল—'বাত তো সহি মৌসী, লেকেন উও সব ঝুলতী আট্টা আপকো থৈলা পে ঘুসা লিজিয়ে না।'

আবার হাসির হররা।

এই জায়গায় কাজলা ভদ্রমহিলার পক্ষ নেয়। উনি ওকে সমর্থন করেছেন, ও-ও সুতরাং ওঁকে মদত দেবে। খুব ভাল, প্রিন্সিপল হিসাবে, কিন্তু এর ফলে ধুন্ধুমার কাণ্ড হতে লাগল।

কাজল বলল—'উনি ওঁর বাড়ির ভাত খেয়ে মোটা হয়েছেন তাতে আপনার কী ?'

মারোয়াড়িনী—'খুদ কো চাবল খায়া, ঔর কোই কো তো নহী। হাঁ-আ।

বাসের লোক—'বাড়ির গাড়িটাও তো চড়লে পারেন, তিন জন লোকের জায়গা নিয়ে একলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

কাজল—'উনি বাড়ির গাড়ি চড়বেন কি না উনি বুঝবেন। বাসটা তো পাবলিক বাস, কারও তো কেনা নয়।'

মারোয়াড়িনী—'কোই তো খরিদ কিয়া নেই। হাঁ হাঁ।'

আমি—'কাজল এবার ক্ষান্ত দে।'

ও পাশের রোগা বাঙালিনী এই সময়ে উৎসাহ পেয়ে বলে উঠলেন, 'যা

বলেছেন। ইনি তো এমন করে বসলেন যেন সিটটা এঁর কেনা। তখন থেকে সিঁটিয়ে বসে বসে আমার সটকা লেগে যাচ্ছে।'

কাজল হাঁ হাঁ করে উঠল—'আপনি নারী হয়ে নারীর বিরুদ্ধে বলছেন? না হয় একটু বসেইছি। আচ্ছা বাবা, উঠে দাঁড়াচ্ছি। রঞ্জু তুই ভাল করে বস, আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি।'

সামনের লোকেরা বলল—'ওরে ব্বাবা, আপনাকে উঠতে হবে না বউদি, আপনি বসেই যা শট দিচ্ছেন, দাঁড়ালে আর দেখতে হবে না।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে। কাজলের অভিমান হয়েছে পাশের মহিলার ওপর। সে সব সইতে পারে, বিশ্বাসঘাতকতা সইতে পারে না। সে উঠে দাঁড়ায় এবং তার রেখে যাওয়া শূন্য স্থানটিতে মাড়োয়ারিনী নিজের বিশাল বপু নামিয়ে দ্যান। 'শুক্রিয়া বহুজী, বহোত বহোত মেহেরবানি আপকী'—মারোয়াড়িনী বলেন এবং বাঙালিনী ফ্যাঁসফেঁসে গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন—'উঃ বাবাগো!'

নিষ্পাপ চোখে তাঁর দিকে তাকায় কাজল—'কী হল ভাই, আমি তো উঠলাম আপনার লাগল?'

ঠোঁটের কোণে পানের পিকের মতো চুটকিভরা হাসি লেগে রয়েছে কাজলের। ওদিকের সিট থেকে এক ছোকরা হাঁকে—'আমি নামছি, বউদি আপনি এখানে বসুন, আর কষ্ট করবেন না।'

একটা হ্যান্ডেলের পর আর-এক হ্যান্ডেল হনুমতীর মতো অবলীলায় হাতাতে হাতাতে উলটো দিকের সিটে কাজল জমিয়ে বসে। 'থ্যাং-কস ভাই।' আমরা চিড়ে চ্যাপটা হতে থাকি। পরের স্টপেই বাঙালিনী হুড়মুড় করে নেমে যান। সামনের ঝুঁকে-পড়াদের মন্তব্য—'নেপোয় মারে দই।'

'নেপোই বটে'—আর এক জন বলে—'একেবারে নেপোলিয়ন'।—'হাঁ হাঁ নেপোলিয়ান' মারোয়াড়িনী বলেন। বাসসুদ্ধ লোক হই হই করে হেসে ওঠে। ইনক্লুডিং কাজল। মারোয়াড়িনী নিজেকে বিস্তৃততর করবার আগেই আমি একটু আলগা হই।

কাজল ওদিক থেকে বলে—'রঞ্জু গুছিয়ে বসেছিস তো? একটু অ্যাডজাস্ট করে নে।'

—'আপনি যা ব্যবস্থা করলেন, বউদি দিদি তো গুছিয়ে বসবেনই!'—এক ছোকরা বলে। অ্যাডজাস্ট হবে বই কী! অ্যাডজাস্টের বাপ হবে!'

কাজলের গম্ভীর গলা শুনতে পাই—'বেশি ফক্কুড়ি করবেন না।'

এই ভাবেই যখন সুমিতাদের কলেজে পৌঁছই তখন আমাদের দুই বন্ধুর মধ্যে বাক্যালাপ নেই। কাজল অবশ্য প্রচুর সাধাসাধি করছে।

'এই রঞ্জু রাগ করছিস কেন?'

'বাসের মধ্যে আমাকে নাম ধরে ধরে ডাকছিলে কেন? একটা প্রাইভেসি

নেই?' উত্তরে কাজলা বলল—'যবে থেকে আমার মেয়ে বড় হয়ে গেছে, তার পেছনে রোমিও লাগতে শুরু করেছে তবে থেকেই ভাই আমার ইনহিবিশন চলে গেছে। অত প্রাইভেসি-টেসি মনে থাকে না। আরে তোদের এক যুগ আগে আমার বিয়ে হয়ে গেছে, মনে রাখিস আমি ভেতরে ভেতরে তোদের থেকে অনেক সিনিয়র, রাস্তার লোক বাসের লোক এদের আমার মনে হয় হাতে তেলোর মতো। কাউকে কমান্ড করতে ভয় পাই না বুঝলি?'

'ঠিক আছে, তুমি কমান্ডান্ট থাকো। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমাকে রেহাই দাও।'

আমরা দু'জনে ছাড়া ছাড়া ভাবে চলতে চলতে একটু আগে পিছে সুমিতাদের কলেজে ঢুকলাম।

কাজল গড়গড় করে এগিয়ে দিয়ে অফিসঘর পেরিয়ে, আরও কী কী সব পেরিয়ে, স্টাফরুমে ঢুকে পড়ল। আমি গতিটা একটু মন্থর করে দিই ইচ্ছে করে। কাজলের জোট বাঁধবার বাসনা আমার এই মুহূর্তে নেই।

শুনতে পাই বলছে—'সুমিতা আজ এসেছে না ডুব মেরেছে?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে ওকে পার হয়ে যাই, খুব ভদ্র, মোলায়েম গলায় বলি—'সাইকোলজির সুমিতা সরকার এসেছেন?' —বলতে বলতে কাজলের দিকে আড়চোখে কটমট করে তাকাই।

জনা দশেক মহিলা ও মেয়ে ঘরটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন।

খুক খুক করে একটা হাসি চাপার আওয়াজ পেলাম।

এক মহিলা টেবিলের ওপর বিরাট একটা কাগজ ছড়িয়ে নিবিষ্ট মনে দেখছিলেন, চশমার ওপর দিয়ে বাকি মহিলাদের ওপর চোখ বুলিয়ে বললেন, এই নিয়ে পাঁচ হল।

'অ্যাঁ? পাঁচ পাঁচ জন সুমিতাকে খুঁজতে এসেছে!'—কাজল ঢুকতে ঢুকতে চেঁচায়। কোনও ইনহিবিশন নেই।

খুঁক খুঁক আওয়াজটা এবার ছড়িয়ে যায়।

একটি মেয়ে মুখ তুলে স্মিত মুখে বলে, 'আপনারা বসুন। বর্ণাদি রুটিন করছেন। আমাকে ক্লাসের কথা বলছেন, আপনাদের নয়।'

'সুমিতা ক্লাসে গেছে,' আর এক জন বললেন।

আমি বসি কাজলের খুব কাছ ঘেঁষে, ফিসফিস করে বলি—'সুমিতা এলেই যেন আবার বিকাশকান্তিবাবুর কদ্দুর টদ্দুর বলে বসো না। তোমার তো মেয়ে বড় হয়ে গেছে, ইনহিবিশন নেই।'

কাজল ফিসফিস করে বলে—'তুই কথা না বললে এগজ্যাক্টলি এটাই বলব এঁচে রেখেছিলুম। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকাতেই হয়!'

এক জন আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—আচ্ছা আপনার মুখটা খুব চেনা-চেনা লাগছে। আপনার কি শান্তিনিকেতনে বাড়ি আছে? আপনাকে আর আপনার হাজব্যান্ডকে ক'দিনই যেন কোথায় বেড়াতে দেখলাম ওখানে!'

কাজল অমনি ঝামরে উঠল—'কালো করে ? মোটা করে তো ? উনি আমার হাজব্যান্ড, ওঁর নয়।'

কেমন একটা অপ্রস্তুত নীরবতার মধ্যে আমরা বসে রইলাম। ঢং। ঘণ্টা পড়ল। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি দুটো কুড়ি। এ আবার কোন দেশি ঘণ্টা বাবা, হয় দুটোর পড় নয়তো দুটো পনেরোয় পড় আর নয়তো একেবারে আড়াইটেয় পড়িস। তারও দশ মিনিট পরে সুমিতা ছাত্রীদের লেজ পেছনে নিয়ে ঢুকলেন। হাতমুখ নেড়ে কী সব বোঝাতে বোঝাতে ঢুকছে। এ সবই কায়দা ওর। লাস্ট মোমেন্টে হয়তো এমন কিছু বলেছে যাতে ছাত্রীদের মনে হয়েছে—ইস্‌স্‌, এটা না জানলেই নয়, পরীক্ষায় নির্ঘাৎ আসছে। আর তাই পেছন নিয়েছে। এ সব সুমিতা দারুণ বোঝে। সাইকোলজির লোক তো!

—'আরে ব্যাপক ব্যাপার। তোরা ?' সুমিতা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল।

কাছে আসতে আমি বললাম—'ব্যাপার ব্যাপক নয়, ব্যাপিকা। আমার পাশেই বসে রয়েছে। ভাল চাও তো বিদায় করো।'

'—সে তো করবই, তার আগে শিঙাড়া-টিঙাড়া খা। কখন বেরিয়েছিস ? চাও-মিন বলব ? না শিঙাড়াতেই হবে ? না কি এগ রোল ?'

—'কী ব্যাপার ? কলেজের মধ্যে রেস্তোরাঁ খুলেছিস না কি ?'

—'আরে দূর। মেয়েরা আসতে চায় না, তাই প্রিন্সিপ্যাল নতুন চপ কাটলেটের ক্যানটিন খুলেছেন।'

ঘরের মধ্যে আবার খুকখুক।

—'ভাল করে প্রাণ খুলেই হাসো না বাবা,' সুমিতা কলীগদের দিকে ফিরে বলল।

—'আমার ক্লাস শেষ। চল ক্যান্টিনেই যাই।'

—'ক্যানটিনে তো আবার তোদের প্রিন্সিপ্যাল বসেন, ওখানে কথা বলা যাবে ?'

এ বার স্টাফরুমের সবাই সত্যিই প্রাণ খুলে হাসতে লাগল। বর্ণাদির পর্যন্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হল, তিনি স্মিত মুখে হাসিতে দুলতে লাগলেন।

সুমিতা বলল—'এটা বীভৎস দিলি তো!'

কাজল কিন্তু হাসছেও না, কথাও বলছে না। ওর অত ফোলাফাঁপা উচ্ছ্বাস যেন হঠাৎ স্যাঁতায় রাখা মুড়ির মতো মিইয়ে গেছে। আমি পরামর্শ দিই, ক্লাস যখন হয়েই গেছে, তখন আর কলেজ-ক্যানটিনে গিয়ে কাজ নেই, বেরোই, অন্য কোনও জায়গায় বসলেই হবে। আসলে আমার ভয় করছে কাজল কখন না বার্স্ট করে। ওর তো আবার ইনহিবিশন নেই।

রাসবিহারীর একটি রেস্তোরাঁর দোতলায় আমরা অভীষ্ট নির্জনতা পেলাম। কাজল বার্স্ট করল—'রঞ্জু তোকে বিশ্বাস করেছিলাম, তোকে বাইরের লোকেই আমার বরের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছে। এবার কী বলবি বল!'

আমি বলি—'সেটাই তো প্রমাণ।'

'কীসের ?'

'আমার বিশ্বস্ততার। আবার কীসের ? গোপনে গোপনে করিনি তো কিছু ? সবার সামনে ঘুরেছি, সবার সামনে কথা বলেছি। তোদের রেস্তোরাঁর বিল দেওয়ার ছিল, ঘাড় ভেঙেছি তোর বরের, সিনেমা তো এখনও হয়ইনি। আমি হয়তো ফ্রেঞ্চ পারফিউম পাবই না। তা ছাড়া কাজলা তুই যদি তোর নিজের বরকে এত সন্দেহের চোখে দেখিস তো এ খেলায় আদৌ নামলি কেন ?' কাঁদো কাঁদো গলায় কাজলা বলল—'দ্যাখ আমি কালো মেয়ে বলে আমার বিয়ে হচ্ছিল না, ঠাকুমা বলতেন কালো ঘর আলো, তা সে কথা তো সবাই বলবে না। বড়দের ডিসিশন হল অল্প বয়স থাকতে থাকতে বিয়ে দাও দাও, অল্প বয়সের একটা আলাদা শ্রী আছে। তা শুভদৃষ্টির সময়ে দেখে আশ্বস্ত হলুম ওর কাছে আমিও ফরসা। খুব গদগদও ছিল। সে গদগদভাব ভাই অনেক দিন কেটে গেছে। নিশ্চিন্ত ছিলাম গণ্ডারের মতো বর কেউ চাইবে না। গণ্ডার হোক ভুণ্ডিল হোক—লোকটা আমারই। তো এখন দেখছি—টেম্পারামেন্টের দিক দিয়ে রঞ্জুর সঙ্গেই ওর বেশি মিল। দু'জনেই সাহিত্য-টাহিত্য করে। রঞ্জু আমার মতো ওকে খেপিয়ে লাটও করে দেয় না। এখন মনটা যদি সত্যিই ফিরে যায়! আমার দাম্পত্য-জীবন চৌপাট। ছেলে এখনও চাকরি পায়নি, মেয়ের পড়া শেষ হয়নি...'

সুমিতা বলল, 'সত্যি রঞ্জুদি, এত সিরিয়াস ?'

'ধ্যাত'—আমি উড়িয়ে দিই।

'তা হলে তুই আজই চ—ও বাড়ি ফিরলে দু'জনকে দিয়ে কবুল করে নিই যে, তোদের দু'জনের মধ্যে কিছু নেই।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি—'কাজলা এমন ভুল কদাপি করিস না, এ সব সাজেস্ট করতে নেই। করলেই মনের মধ্যে সেঁটে যায়। সুমিতাকে জিজ্ঞেস কর ও তো সাইকোলজির লোক।'

সুমিতা বোদ্ধার মতো ঘাড় নাড়ল।

'তোর কদ্দূর ?'

'বহু দূর বহু দূর বাকি। এখন সাইকোঅ্যানালিসিস করব। শিগগির সিটিং। ভদ্রলোক ইন্টারেস্টিং। ফাইন্ডিংস তোদের পরে বলব। রেস্তোরাঁর বিল মানে গ্র্যান্ডের বিলটা যদি চাস, এখুনি দিয়ে দিতে পারি, জেরক্স করে রেখেছি, ওঁরটা ফিরিয়ে দিতে হয়েছে তো ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে লাগে।'

'তোর তা হলে পুরো সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ ?'

'একেবারে।'

'আর তোর শুভম ?'

'ওটার কথা আর বলিসনি, টুপি নিয়েই জন্মেছে। মালবিকাদিকে তো বাড়িতে এনে তুলেছে!'

'সে কী রে ?'

'আর বলিসনি। একদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে দেখি মালবিকাদি আমাদের বেডরুমে জাঁকিয়ে বসে আছে আমার দুটো ছানা ওর কোলে-পিঠে শাশুড়ি ঠাকরুণ গান গাইছেন আর শুভম তবলায় ঠেকা দিচ্ছে পাজামা পাঞ্জাবি পরে। আমাকে দেখে শাশুড়ি ঘোমটা দিয়ে জিভ কাটলেন।'

'এ কী সুমিতা তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরলে ?

আমি বলি, 'বেশ তো "আমিও একাকী তুমিও একাকী" হচ্ছিল, থামলেন কেন ?'

'তোর শাশুড়ি বুঝি গান গাইতে পারেন ?'

'রীতিমতো। এদিক ওদিক থেকে সুর ভেসে আসে শুনি, ছবি বাঁড়ুজ্জের মতো গলা। আমি এলেই চুপ, যেন আমিই ওঁর শাশুড়ি।'

'ও তো আজকালকার দিনে তো রোল উলটেই দিয়েছিস তোরা।'

'বাজে বকিসনি। তো শুভম কী বললে জানিস ?'

'কী ?'

'বললে, "তা হলেই বোঝো তুমি কতটা বেরসিক।" আমার ছানাদুটো হেসে উঠল। আমি বললুম—"তা এ মহিলাটি কে ?" ছানারা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল—"মালবিকাদি মালবিকাদি।"

'—মালবিকাদি ? মাসি বলতে পারো না ? আমি বলেছি। 'আয় আয়, রাগ করছিস কেন ?' উনি বললেন, 'আমি ইউনিভার্সাল মালবিকাদি। তোরও, তোর বরেরও, তোর মেয়েদেরও, এমন কি মাসিমাও আমাকে মালবিকাদি বলছেন।' শুভম বলল—'আরে, তোমরা কি পরস্পরকে চেনো না কি ?'

'ইডিয়ট একটা,' কাজলার বক্তব্য।

মালবিকাদি বলল—'কফি হাউসে শুভমের সঙ্গে আলাপ, সে একেবারে জমজমাট বুঝলি সুমিতা। তখন তো বুঝতে পারিনি তোর বর, তাই প্রচুর ঘাড় ভেঙেছি। তা আজ এই বাড়িতে ধরে নিয়ে এল। মতিলাল নেহরু রোড, সাত নম্বর দেখেই তো বুঝেছি তোর বাড়ি। তারপর এই কুচিদুটোকে দেখে সন্দেহ একেবারে ঘুচে গেল। দুটো ছোট্ট ছোট্ট সুমিতা। তখন থেকে তোর জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। কিছু ভাঙিনি। শুভম নিরাশ গলায় বললে—পৃথিবীর সবার সঙ্গে কি তোমার চেনা ? কোথায় ভাবলুম একটা প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ দেব !'

'প্লেজেন্ট কি আনপ্লেজেন্ট আবার দ্যাখ'—মালবিকাদি শাশুড়িকে পান দিল, শুভমকে পান দিল, নিজে পান মুখে পুরল। শাশুড়ি বললেন—খুব প্লেজেন্ট, খুব প্লেজেন্ট, বলে "মম চিত্তে নিতি নৃত্যে" ধরে ফেললেন, মেয়ে দুটোর এ নাচটা জবর তোলা ছিল, ওরা অমনি তাধিন তাধিন আরম্ভ করে দিল, শুভমের সে কী তবলাবাদন, কাঁধদুটো উঠছে নামছে-উঠছে নামছে। ফলে আমাকেও দু'-চারটে ফিগার দিতে হল, মালবিকাদি দেখি পায়ে তাল দিচ্ছে, শেষ হলে বলল—কেয়াবাত, কেয়াবাত, আমি বললুম এটা কত্থক নয়, কেয়াবাত বলে

না। এটা ওড়িশি। তখন কী বলল জানিস ?'

'কী ?'

'উত্তম-অ হউচি।'

ব্যস। এই কথায় ফট করে আমার স্বপ্নটা মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বললুম, 'এই সুমিতা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি তার কিনারা করে দে তো।'

'ওঃ, তুই আবার স্বপ্নের পুঁটলি খুলবি ?

'কেন, তোর বোর লাগে ?'

'না, তা নয়। কদিন অ্যানালিসিসটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে তো ?'

'সেটা করছিস নিজের ঢাকাই শাড়ির স্বার্থে। আর এটা একটা বিশুদ্ধ অ্যাকাডেমিক ব্যাপার।'

'তো বল।'

বললাম।

চকচকে চোখে 'সাইকোলজির লোক' বললেন—'একটু ভাবি, পরে বলব। একটা দিন অন্তত সময় দে।'

ফেরবার সময়ে কাজলের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও আমরা একটা ট্যাকসি নিই। কাজলাকে নিয়ে বাসে ওঠার ঝুঁকি আর নিচ্ছি না। সুমিতা অভিভাবকের মতো বলল—'দিদিদের ভাল করে পৌঁছে দেবেন সর্দারজি।"

'জরুর জরুর।'

'টাইম কেতনা লাগে গা !'

'এক ঘণ্টা, ঔর কেতনা !'

ট্যাকসিতেও কাজল ঝঞ্ঝাট বাঁধাল।

ট্যাসসি ড্রাইভারের নাম জিজ্ঞেস করল—নাম ভগৎ সিং। তখন কাজল জানতে চাইল বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর ইনি কেউ হন কি না, নাতি কি, পুতি কি কিছু। সর্দারজি বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের নাম শোনেননি। তখন কাজল একদিক থেকে বলদেও সিং, জৈল সিং, বুটা সিং, মিলখা সিং, বিষেণ সিং বেদী, নভজোত সিং সিধু হয়ে রিল্যাক সিং-এ এসে থামল। এঁদের সকলকেই সর্দারজি চেনেন খবরের কাগজের পাতায় যেমন আমরাও চিনি। খালি রিল্যাক সিংকে সর্দারজি কিছুতেই চিনতে পারলেন না। এক হাত স্টিয়ারিংয়ে এক হাত নুন মরিচ দাড়িতে—'রিল্যাক সিং ? ইয়ে শুভনাম তো ম্যায়নে কভ্ভি শুনা নহী থা।' সর্দারজি—ঘাড় নাড়তে থাকেন। তখন কাজল সেই বহুশ্রুত গল্পটি সর্দারজিকে বলে—'জানেন তো সর্দারজি, মিলখা সিং এক বার দৌড়ক্লান্ত হয়ে বসে আছেন, এক জন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—আ ইউ রিল্যাক সিং ? তাতে মিলখা সিং জবাব দিলেন—নো আ অ্যাম মিলখা সিং।' সর্দারজি গিয়ার চেঞ্জ করতে করতে বললেন—'তো উনহোনে তো ঠিকই কিয়া বহেনজি ! উও তো মিলখা সিং-ই থা, রিল্যাক সিংজি কোই দুসরা খিলাড়ি হোগা, ঠিক ইয়া নহী ?'

কাজল বলল—'হাঁ হাঁ ঠিক ঠিক। বিলকুল ঠিক বাত।' আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। এ বার ও বলদেও সিং-এর সেই বিখ্যাত গল্পগুলো ঝুলি থেকে ঝাড়বে না কি? ইনহিবিশন তো নেই-ই ওর দেখা যাচ্ছে কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। কিন্তু না, কাজল এ বার ইনিয়ে বিনিয়ে যশজিৎ সিং-এর কথা জিজ্ঞেস করে।

'ভবানীপুরমে উসকো রোটি তরকাকা দুকান হ্যাঁয়। পহচানতা হ্যাঁয় আপ?'

'জরুর জরুর। দুকান তো উসকো পিতাজিকা হ্যায়। বহোৎ বড়া ধাবা বহেনজি।' এ বার কাজল সোৎসাহে বলল 'উসকো এক বংগালি গার্ল ফ্রেন্ড হ্যায়, রাংতা। পহেচানতা আপ?' বাস বোম ফেটে গেল গাড়ির ভেতর।

'মনজিৎ সিংজিকা আওলাদ যশজিৎ লড়কি ঘুমাতা? আপ নে খুদকো আঁখ সে দেখা?'

কাজল চুপ। সর্দারজি গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিলেন।

আস্তে আস্তে। আমি অনেকবার বললাম। কোনও কাজ হল না। রিয়ারভিউ আয়নার মধ্যে মাঝে মাঝে শুধু ঝলসে উঠছে, দুটো জ্বলন্ত কয়লার মতো চোখ, ফুলে-ওঠা কাঁচাপাকা দাড়ি, টেপা ঠোঁট।

প্রাণ হাতে করে বাড়ি ফিরে এলাম পাক্কা পঁচিশ মিনিটের মধ্যে। গড়িয়াহাট টু যাদু ঘোষের লেন। দু'জনে একসঙ্গে উঠেছি, একসঙ্গে নামব। মরতে হলে দু'জনে একসঙ্গে মরব। আমার বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে সর্দারজিকে দশটা টাকা বেশি দিলাম। গম্ভীর মুখে দশ টাকা ফিরিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেলেন সর্দারজি।

আমি বললাম—'কাজল, একটা রিকশা নিয়ে বাড়ি চলে যা।'

'এক কাপ চা খেতাম।' কাজল বলল। 'বাড়িতে চা নেই।' আমার মুখ দেখে কাজল আর কিছু বলবার সাহস পেল না। নিতাই রিকশাওয়ালা আমাদের খুব চেনা, তাকে ডেকে কাজলকে উঠিয়ে দিয়ে বাড়ি ঢুকে গেলাম।

ভয়ে আর রাগে ভুলেই গিয়েছিলাম বাড়িতে শিল্পীকে বসিয়ে গেছি।

ভুরভুর করে খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে রান্নার। অচেনা-অচেনা বিদেশি-বিদেশি গন্ধ। শিল্পী আমার একটা হাউজকোট পরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'তুমি এর মধ্যে?'

'অসুবিধা হল?' আমি গম্ভীর।

'বা রে নিরুপমদা তো এখনও আসেইনি। কত কষ্ট করে তাই রান্না করছি।'

'আমি থাকলে কি খাওয়াটাও নিরাপদে হবে না, আমি কি বেরিয়ে যাব?'

'বাব্বা ফায়ার ব্রিগেড হয়ে আছ যে! হলটা কী?'

'প্রাণটা আজকে যেতে বসেছিল, মান তো গেছেই, তোমাদের কাজলদিকে

নিয়ে আমি আর কখনও বেরোচ্ছি না।'

'সে তো আমরা অনেক দিনই জানি। গঙ্গা জামাইবাবুর একটা গাড়ি কেনা উচিত। ট্রামে-বাসে ট্রাভল করার পক্ষে কাজলদি নিরাপদ নয়। আমাকে নিলেই পারতে।'

'এটা তো আগেও সাজেস্ট করতে পারতে। তখন তো আমি থাকব না, আমার অনুপস্থিতিতে এ বাড়ি আসতে পাবে শুনেই নেচে উঠলে।'

'যাও যাও বিশ্রাম করো গে যাও,' শিল্পী বলল, 'মেজাজ ঠাণ্ডা হলে নেমো। আমি বাবা রান্নাটা শেষ করি গে।'

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটার সময়ে সুমিতা ফোন করল।

'কি রে রঞ্জুদি, পৌঁছেছিস?'

'আমার চোদ্দো পুরুষের ভাগ্য ভাই যে নিজসদনে পৌঁছেছি। যমসদনেই যাবার কথা ছিল।'

'সে কী? অ্যাকসিডেন্ট?'

'নাঃ, তার চেয়েও খারাপ। কাজল!'

'কাজল? কা-জল? ওঃ কাজল! আবার গণ্ডগোল করেছে?'

'আবার?' 'যাক বেঁচে আছিস তা হলে। তোর স্বপ্নটার অ্যানালিসিস দেবার জন্যে ফোন করলুম। চেম্বার থেকে করছি।'

'এর মধ্যে হয়ে গেল? বললি যে দু একদিন সময় দিতে?'

'আরে তক্ষুণি হয়ে গেছিল। কাজলদির সামনে বলতে চাইনি।'

'কেন?'

'আরে এমনিতেই যা শেকি হয়ে আছে।'

'ওর সঙ্গে আমার স্বপ্নের কী সম্পর্ক?'

'ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভাই। উত্তমকুমারটা উত্তমকুমার নয়।'

'উত্তমকুমার উত্তমকুমার নয়? এ কি হেঁয়ালি না ধাঁধা?'

'আরে বাবা ওটা গঙ্গাপ্রসাদ মিত্তির।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'শোন, সম্প্রতি তুই কোনও পুং দ্বারা আলোড়িত প্রভাবিত হয়েছিস। এখন তার সঙ্গে তুই কথা বলতে চাস, সম্পর্ক পাতাতে চাস, কিন্তু তোর বিবেক, আমাদের ভাষায় তোর সুপারইগো তোকে ধমকাচ্ছে, তাই তুই মানে তোর অবচেতন একটা প্রতীক বেছে নিয়েছে, একটা কমন সিম্বল। উত্তমকুমার সেই সিম্বল।'

'মানে বলছিস গঙ্গাপ্রসাদে উত্তমকুমারে অভেদ।'

'এগজ্যাক্টলি।'

'গঙ্গাদা এই অভেদে খুশি হলেও হতে পারেন। কিন্তু উত্তমকুমার বড্ড রাগ করবেন।'

'আরে তিনি তো আর রাগ-ঝাল করবার জন্য বেঁচে নেই!'

'তা তোর এই বিশ্লেষণ কি অভ্রান্ত?'

'মোস্ট প্রব্যাবলি। মন খারাপ করিসনি রঞ্জুদি, মনের অগোচরে তো পাপ নেই।'

কিন্তু আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। আসল কথা মনের গোচর থাকলেই আমি স্বস্তি পেতাম। মনের গোচরে, মানে সজ্ঞানে তো আমি গঙ্গাপ্রসাদকে পছন্দ করছিই। তাঁর অত সুন্দর কণ্ঠস্বর, অত ভাল আবৃত্তি করেন, জীবনানন্দ আমারও প্যাশন, সেই জীবনানন্দ উনি অমন ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছেনে ছেনে ব্যাখ্যা করেন। তারপর আমার নাম নিয়ে উনি অমন সুন্দর রোম্যান্টিক কবিতা পড়েন। খুবই বোদ্ধা এবং রসিক মানুষ। পছন্দ করেছি বলেই ওঁকে আমি গঙ্গাদা বলে ডেকেছি। কাজল ওঁকে গণ্ডার বললেও আমি তাঁকে আরও শিক্ষিত করেছি, ওঁর মধ্যে এক শান্ত স্বভাব অথচ গতিময় বাইসনকে দেখেছি, গুহাচিত্রের মতো ঠিক। উনি এমনিই আসুন না, গল্প করুন না, সাহিত্য নিয়ে যেই কথাবার্তা শুরু হবে কাজল তো দু-একটা টিপ্পনী কেটে শেফালির সঙ্গে আড্ডা দিতে উঠে যাবেই। নিরুপম যখন দেখবে দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে গঙ্গাপ্রসাদ ওয়াকিবহাল নয়, তখন মুখে এক গোপন পাতি বুর্জোয়াপ্রাণিত গেরেস্তারি শ্লেষের হাসি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় মনোনিবেশ করবেই। সে সময়ে গঙ্গাপ্রসাদ 'মাল্যবান' প্রসঙ্গে আসুন না, রবীন্দ্রনাথের ছবি আর জীবনানন্দের উপন্যাস যে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানে একই, সেই তুলনা করুন না, আমি শুনি, আমার অল্পস্বল্প যা বিদ্যে বা বোধ আছে তাকে কাজ করতে দিই। এই সব। এই সব আমি চিনি। কিন্তু মনের অগোচরে মহানায়কের ছদ্মবেশে ঘাপটি মেরে বসে থাকা গঙ্গাপ্রসাদকে তো আমি চিনি না! চাই না!

দ্বিতীয় অধিবেশন

আমাদের পরবর্তী আড্ডার দিন স্থির হয়ে গেছে। কাজলের বাড়িতে গঙ্গাপ্রসাদ এবং অনীক-তীর্ণা ও তাদের বন্ধুরা সুতরাং কাজলের বাড়ি বাদ হয়ে যায়। মালবিকাদির বাড়ি অনেক শরিক। নিজেদের অংশ ঠিকই আছে। কিন্তু পাঁচিল টাঁচিল নেই। তা ছাড়া বিকাশকান্তিবাবু অফিস থেকে ফিরবেন, তিনি তারপরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন নীরবতা চাই, সুতরাং এ বাড়িও বাদ। সুমিতাদের বাড়িতেও শ্বশুর-শাশুড়ি তাঁরা খুবই মাই ডিয়ার তবু... তা ছাড়া সুমিতার মেয়েরা আছে, শুভমও তো বাড়ি আছে। সুবিধে হবে না। শিল্পী খুব ধরেছিল আড্ডা ওর বাড়িতে হোক, কিন্তু চন্দন একেকদিন বড্ড তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে, বাতিল করে দিলাম। সব দিক বুঝেশুনে যাদু ঘোষের স্ট্রিটেই দ্বিতীয় অধিবেশনের ভেনু স্থির হয়। নিরুপম গড়াই গড়াতে গড়াতে রাত্তির আটটা

সাড়ে আটটা করে ফেলেন। শান্তর এখনও হাত বাঁধা, কিন্তু বিকেলে সে ক্লাবে যেতে পারছে। নিজে না খেললে কী হবে, অন্যদের খেলা তার দেখা চাই-ই। তারপর সন্ধেয় বাড়ি ফিরে তার নতুন টিউটর হয়েছে প্রশান্তদা, সে এলেই শান্ত নিজের ঘরে চুপচাপ। প্রশান্তদা পড়াশোনাতেও সোনার চাঁদ, অ্যাথলেটিকসেও প্রচুর মেডেল। সুতরাং প্রশান্তদা এখন শান্তশীলের হিরো। সলমন খান-শাহরুখ খান না হয়ে প্রশান্তদা হিরো হওয়ায় আমরাও খুব নিশ্চিন্ত।

মালবিকাদি বলেছে মাংসের চপ নিয়ে আসবে, শিল্পীর অবদান ফিশ বলস ইন তো মিয়াম উইথ বেসিল লিভস, আবার শেফালি বলেছে মুড়ি বেগুনি সাপ্লাই দেবে যত লাগে, কাজল পাড়ার দোকান থেকে সরভাজা আনছে আর সুমিতা নাকি কুইন এলিজাবেথ যে চা খান সেই জিনিস পেয়েছে, তা-ই আনছে।

আমরা শনি রবিবারে আড্ডা দিই না। উইক ডে-তে দিই। আজও শুক্রবার।

শিল্পীই সবচেয়ে আগে এল। ওর বর ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল। বিরাট এক হাণ্ডার মতো ক্যাসেরোল নামাল গাড়ি থেকে। এরই মধ্যে সেই ফিশ বলস ইন তো মিয়াম উইথ বেসিল লিভস।

চন্দনকেও ডাকলুম—'আসুন না, একটু বসে যাবেন।'

'আরে ম্যাডাম আমি এয়ারপোর্ট যাচ্ছি, জার্মানি থেকে কোম্পানির গেস্ট আসছে রিসিভ করতে হবে।'

'তা হলে ফেরবার সময়ে! কাজল থাকবে।'

'আরে কাজলা তো আমায় বলেনি কিছু! বললে না হয় আগে থেকে এয়ারপোর্টে একটা ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করা যেত।'

'ও কাজলা বললে? আমরা বলছি সেটা কিছু না?'

'আরে মশাই কলেজের প্রেম, এ ডাকের রোম্যান্সই আলাদা...'

বলেই চন্দন হুশ্‌শ্‌ করে বেরিয়ে গেল।

'দেখলে? দেখলে' শিল্পী আমায় বলল।

আমি বললাম, 'নিরুপমদা কিন্তু বেরিয়ে গেছে আরও সকালে।'

'কী হিংসুটি। কী হিংসুটি! আমি যেন জানি না নিরুপমদা কখন বেরোবে! কিন্তু শান্ত আর নিরুপমদার জন্যে তো মিয়াম আগে সরিয়ে রাখো, মালবিকাদির হাতে পড়লে এক ফোঁটাও থাকবে না।'

আমি ডাকলুম, 'শেফালি!'

গৃহিণীপনায় আমি একেবারেই অচল অধম। শেফালি আর শিল্পী মিলে যা হয় করুক। শিল্পী শুধু তাই খাবারই আনেনি, খাবার সুন্দর সুন্দর কাচের তাই বাটিও এনেছে, বাটি, চামচ, প্লেট।

বললে, 'তোমার তো কিচ্ছু নেই। হয়তো কাঁসার বাটি বার করে দেবে।'

যা খুশি বলুক—আমার আজকে খুব পুলক। কেননা, আপনারা বললে

বিশ্বাস করবেন কি না জানি না আমারও কিছু ভক্ত পাঠক আছে, তারা আজ সকালে আমাকে রাশি রাশি ফুল দিয়ে গেছে। নিউ মার্কেটে আরও কোথায় কোথায় এদের ফুলের দোকান আছে। ফুলের চাষ করে। শুনতে খুব খারাপ লাগে কিন্তু ওরা ফুলকে 'মাল' বলে। বর্ষার ফুল দিয়েছে প্রচুর ডবল জুঁই, মালতী, কেয়া, জুঁইগুলো মালা গাঁথা, দিয়েছে গোলাপও, ঈষৎ হলুদ আভাযুক্ত সাদা গোলাপ। বলে গেল, 'মালটা এ ক্লাস দিদি। গন্ধে মাত করে দেবে।'

আমি বসবার ঘরটায় গোল একটা সাইড-টেবলের ওপর তোলা কাঁসার কানা উঁচু থালায় কাঁচা শালপাতা পেতে জুঁইয়ের মালা কয়েকটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল করে রাখি। একটা কোণে একটা কেয়া রাখি কালো পাথরের গেলাসে। আর মাঝখানে বড় কার্পেটটা পেতে কাঁসার ডাবরে গোলাপগুলো গুচ্ছ করে রাখি। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিই। এর পরেও যথেষ্ট ফুল থেকে যায়। আমাদের প্রত্যেক শোবার ঘরে, পড়ার ঘরে কোনও না কোনও মহাপুরুষের ছবি আছে।

আমার ঘরে শ্রীচৈতন্য, নিরুপমের ঘরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সারদা মা, শান্তর ঘরে বিবেকানন্দ। সব ছবিতে আমি মালা পরিয়ে দিই। এ ছাড়াও আমার ঘরে রাখি কেয়া, নিরুপমের ঘরে গোলাপ, শান্তর ঘরে মালতী, আর শেফালির ঘরে শ্রীদেবীর একটা আর মা কালীর একটা ক্যালেন্ডার আছে, ওর উপাস্যা দেবী। এঁদের গলাতেও জুঁইয়ের মালা পরিয়ে দিই।

একটার সময়ে সরভাজার বাক্স নিয়ে কাজলা এসে যায়। হাতে একটা লম্বা থলে, কিছুতেই সেটা হাত ছাড়া করে না সে। দুটো বাজতে পনেরো মিনিটের মাথায় আসে মালবিকাদি গোটাগুটি একটি টিপিনকারি হাতে ঝুলিয়ে।

'গজব থেকে কিনে আনোনি তো?' কাজল জিজ্ঞেস করে।

'হুঁহ! এ হচ্ছে ঘোষাল ফ্যামিলির ট্রেড সিক্রেট, কোনও গজবে এ জিনিস পাবি না।'

সুমিতা যে লেট লতিফ সেও কাঁটায় কাঁটায় দুটোয় এসে গেল। বললে, 'শেফালি তোমাদের চায়ের পট গরম জল, আর ভিম দিয়ে ধোও, তোলা চায়ের সেট বার করো। গোরুর দুধ এনেছি, ফুটিয়ে চাপা দিয়ে রাখবে, তা সত্ত্বেও সর পড়ে গেলে তুলে দেবে, চিনি দুধ সব পটে রাখবে কাঁটায় কাঁটায় আড়াইটে বাজতে পাঁচ মিনিটে জল বসাবে, টগবগ করে ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে ঝটাপট পার কাপ এক চামচ করে পাতা পটে দিয়ে গ্যাস অফ করে দেবে। জলটা এক দফায় ঢালবে। ভাল ধার কাটে এমন সসপ্যান নিয়ো। তারপর এভরিথিং চায়ের পট, ছাঁকনি, দুধ চিনির পট সব সুদ্ধ আমাদের ওখানে দিয়ে এসো।'

কাপ-প্লেট চামচ ছাঁকনি সুমিতা নিজেই ট্রে-সুদ্ধু নিয়ে আড্ডা ঘরে ঢুকে গেল।

ঢুকেই সব্বাই বলল, 'আ-হ, এ যে ফুলশয্যার ঘর সাজিয়েছিস রে রঞ্জু।'

সুমিতা বলল, 'এ মা। সব মাটি করে দিলে।' প্রায় কেঁদে ফেলে আর

কি!

'আচ্ছা বেরসিক তো!' শিল্পী কাজল সবাই তেড়ে উঠল। মালবিকাদি এই মারে তো সেই মারে।

'মেয়েটা এক দিনের জন্যে নিজের মনোমত ফুল সাজিয়েছে, আর তুই তোর ইকেবানা ফলাতে এসেছিস?'

'ইকেবানা নয়?' কাঁদো-কাঁদো গলায় সুমিতা বলল, 'এত ফুলের গন্ধের মধ্যে চুমু খাওয়া যায় কিন্তু রানির চা খাওয়া যায় না। রঞ্জু তুই প্লিজ অন্তত কেয়া আর জুঁইগুলো সরা।'

'কী আশ্চর্য, আমি বলি— কেয়ার গন্ধ এখনও বেরোয়ইনি। রাতে বেরোবে।'

'জুঁইয়েরটা বেরোচ্ছে, ভুরভুর করে বেরোচ্ছে, প্লিজ রঞ্জু, চা খাওয়া হয়ে গেলেই আমি আবার ঠিক জায়গায় রেখে দেব।'

কী আর করা! জুঁইয়ের মালা সুদ্ধু টেবিল আমি খাবার ঘরে রেখে আসি। কেয়াফুলের গেলাস খাবার টেবিলের ওপর শোভা পায় আপাতত।

আড়াইটে পর্যন্ত সাংঘাতিক টেনশনে কাটে আমাদের। রানির চা খাওয়ার বাসন, পরিবেশ, রানির চা তৈরি করার প্রক্রিয়া সবই এত সুকুমার যে আমরা ভেতরে ভেতরে নিজেদের গলিয়ে গলিয়ে নরম করে ফেলতে থাকি। চায়ের ডেলিকেটত্বর সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে যাই। শিল্পী আতর মেখে এসেছে টের পেয়ে তার শরীরের কোনও নিভৃত কোণ থেকে আতরভেজা তুলোর টুকরো সুমিতা টেনে বার করে ফেলে দেয়। মালবিকাদিকে প্রথমে ডেটল সাবান তারপরে লিরিল দিয়ে হাত ধুয়ে আসতে বলে। মালবিকাদির হাত দিয়ে নাকি এখনও মাংসের গন্ধ বেরোচ্ছে। এ-ও সে মনে করিয়ে দেয় যে পান-জর্দার সঙ্গে রানির চা চলে না। একমাত্র কাজল তার ক্লোত্র পারফ্যুম-মাখা শাড়ি পরে নির্বিকার বসে থাকে। সুমিতা তাকে অনেক সাধাসাধি করে—'যা না রঞ্জুদির একখানা পাটভাঙা শাড়ি পরে আয় না।' কাজল বলে সে কোনও পারফ্যুমই মাখেনি। বড্ড গরম তাই একটু ঘেমেছে।

বললে 'সত্যি তোরা একটা মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিস? শুনেছিলুম বটে পদ্মিনী নারীদের শরীরের নির্যাসে পদ্মগন্ধ থাকে। সে ক্ষেত্রে আমাকে সরে যেতে হয়, আমাকে বাদ দিয়েই তোরা রানির চা খা।'

তারই কাছে একমাত্র সুমিতা হেরে যায়। তবে সে বারে বারেই আমাদের দাস মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করে।—'রানির চা আবার কী? দার্জিলিঙের চা। আমাদের ভারতবর্ষের, পশ্চিমবঙ্গের, দার্জিলিঙের চা। ইংল্যান্ডের রানি আমাদেরটা খান।' অথচ 'রানির চা' কথাটা ও নিজেই বলেছিল।

শেষ পর্যন্ত আড়াইটে বেজে এক মিনিটে আমরা সেই দুর্ধর্ষ চা পান করি।

দেখতে ন্যাতা-ধোয়া জলের মতো। খুশবু ভাল হলেও আহামরি কিছু নয়। মালবিকাদি তো কোনও গন্ধই পায় না। তারপর আবার জুঁইফুলের টেবিল আসে, কেয়াফুলের গেলাস আসে। এবং আমরা আমাদের গবেষণার ফলাফল এবং প্রমাণ সব বার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

মালবিকাদির বিল মোট এগারোটা—সাবির, আমিনিয়া, গজব, সুতানুটি জংশন, ওয়ালডর্ফ, ব্লু ফক্স, এ্যামবাসি, পিটার ক্যাট, বালিগঞ্জ ধাবা, তাজবেঙ্গলের সোনার বাংলা এবং বাঙালির আদর্শ হোটেল। মোট সাড়ে চার হাজার টাকার বিল সিনেমা-থিয়েটার গানের আসর মিলিয়ে ন' জোড়া টিকিট। মালবিকাদি খুব লজ্জিত গলায় বলে, 'কিছু মনে করিসনি সুমিতা, আমিও যত খেতে পারি, তোর বরটাও তত খেতে পারে, আর চারটে মাস মোটে ছুটি বেচারির, তুই তোর সাইকোথেরাপি নিয়ে ব্যস্ত, ওকে তো থিয়েটার-সিনেমাগুলো দেখতে হবে।'

—'আমি কি তোমাকে কিছু বলেছি ?' সুমিতা বলল।

মালবিকাদি বলল—'তবে ছেলেটা সত্যি ছেলেমানুষ। সুমিতার ধারণার সঙ্গে আমার ইমপ্রেশান একবারে মিলে গেছে 'মজাদার, আমুদে। আচ্ছা সুমিতা রাধেশ্যাম বলে ওর কোনও বন্ধু আছে ?'

—'সেই হতভাগার সঙ্গেও তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছে না কি ?'

—'না, তা নয়। আসলে ওর জাহাজি চাকরির মূলে ওই রাধেশ্যাম।'

—'হ্যাঁ শুনেছি বটে, রাধেশ্যামের নাম ওর ঠিক আগে ছিল, রাধেশ্যাম না নিতে নাকি ও ম্যারিনে চান্স পায়।'

—'ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।' মালবিকাদি বলে, 'ওর মধ্যে একটা রোম্যান্টিক বিষণ্ণ দিক আছে সেটা সুমিতা লক্ষ করিসনি কেন জানি না। আসলে ও খুব দাগা পেয়েছিল। ওই রাধেশ্যামই ওর প্রথম প্রেমিকার সঙ্গে ভিড়ে যায়। এ কথা ও কাউকেই কোনওদিন বলেনি। সুমিতা তুমিও কখনওই ওকে বলবে না যে আমি বলেছি। সুমিতাকে অনেকটা সেই মেয়েটির মতো দেখতে বলেই ও সুমিতার থেকে পালিয়ে বেড়ায়, আবার ছুটেও আসে।'

সুমিতা ওর ব্যাগ থেকে একটা শ্যানেল নংফাইভের মোড়ক বার করে দেয়। ওর মুখে কথা নেই।

সেকেন্ড গেল কাজলা। আটটা রেস্তোরাঁ, পাঁচটা নন্দন, রবীন্দ্রসদন। পরীক্ষা করে নিয়ে সুমিতা আর একটা মোড়ক বার করে।

'তোমার কী বলবার আছে বলো।'

কাজলা বলে 'আছে। কিন্তু শিল্পী যদি ভয় পেয়ে যায়।'

'কেন ? কী হয়েছে ?' শিল্পী আঁতকে ওঠে—'আর একটা বিয়ে করেছে নাকি ? বিগ্যামি ? সে পক্ষেরও একটা ছেলে ?'

'আরে না না। নিমাই সন্ন্যাস।'

'তার মানে ?'

'চন্দন হপ্তায় দু'দিন করে বেলুড় মঠ-দক্ষিণেশ্বরে যায় জানতিস ?'

'না তো !'

'সন্ন্যাস নিতে চাইছে। স্বামীজিরা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না বলে আটকে আছে ব্যাপারটা। যেদিন হবেন সেদিনই ও তুলতুল, শিল্পী, বিশ হাজারি চাকরি, দেশভ্রমণ সমস্ত ছেড়ে চলে যাবে।'

শিল্পীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সে বলল—'সত্যি বলছ ?'

'মিথ্যে বলে আমার লাভ ? নিজেও ভক্ত, বৈরাগ্য এসে গেছে এই সব ভাব-টাব করে ওর পেট থেকে কথা বার করেছি। অত কৃষ্ণমূর্তি পড়ে তখনই তোর বোঝা উচিত ছিল। ফিলসফিকাল বেন্ট'

শিল্পী পুতুলের মতো ওর ব্যাগ থেকে রেস্তোরাঁর বিলগুলো বার করে দিল। চারটে রেস্তোরাঁ, তিনটে দর্পণা, রবীন্দ্রসদন আর কলামন্দির।

ছলছলে চোখে বোজা গলায় বলল—'রঞ্জুদি তোমাদের এত খরচ করিয়ে দিয়েছি বলেই বোধ হয় আমার এমন শাস্তি হল। তবে বিশ্বাস করো এর চেয়ে বেশি আমি নিরুমপদাকে রান্না করেই খাইয়েছি। সে তুলনায় তোমার বরের পকেট এমন কিছু ফাঁকা হয়নি।'

'আমি কি তোকে কিছু বলেছি ?' আমি নরম গলায় বলি।

সুমিতার দেওয়া পারফ্যুমের শিশিটা যেমন কে তেমন পড়ে থাকে।

'কিন্তু রঞ্জুদি একটা কথা আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি' শিল্পী বলল—'নিরুপমদা তোমাকে যথেষ্ট ভালবাসে এবং মিস্ করে। আসলে তুমি ওর থেকে সুপিরিয়র এই একটা ওয়ারি, দুশ্চিন্তা সব সময়ে কাজ করে যাচ্ছে ওর ভেতর, তাই তোমার কাছে নিজেকে ওপ্ন করতে পারে না। আমি এটার আভাস পেয়েছি। সত্যিই বলছি, নিরুপমদার ওপর এখন আমার একটা রীতিমতো টান এসে গেছে। আমার দাদা নেই বউদি নেই, সত্যি যদি চন্দন আমাদের ছেড়ে চলে যায় রঞ্জুদি তোমরা আমাদের একটু দেখো।'—বলতে বলতে শিল্পী কেঁদে ফেলল।

আবহাওয়াটা ভারী হয়ে গেছে। তারই মধ্যে আমি সবেধন নীলমণি প্রিয়া রেস্তোরাঁর তিনটি বিল বার করি। যেন যাই ঘটুক না কেন এগুলো আমাদের স্বীকৃত দায়। বলি—'আমি ভাই কোয়ালিফাই করিনি। সিনেমা কোথায় ওখানে ? ওই তো 'বিচিত্রা'য় যা হচ্ছিল ছোট বউ না বড় বউ না সখা-সখী ও সব আমি দেখতে যাব বলতে পারিনি। আমার পারফ্যুম চাই না।'

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না রে ?' কাজলা খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল। 'যেখানে ভাল হল নেই, ভাল ছবি নেই সেখানে তোদের মতো রুচিশীল রুচিশীলারা কী-ই বা করতে পারে ? তা শালবনে আমবনে তো বেড়িয়েছিস তাতেই হবে। সুমিতা ওকে ওর গিফ্টটা দিয়ে দে।'

সুমিতা আমার হাতের মধ্যে জোর করে জিনিসটা গুঁজে দিল।

'তা সে যাক', কাজল বলল, 'সে কী বলে ? সেও কি সন্নিসি হয়ে যাবে ?'

'তোর বর তো এক রকম সন্ন্যাসীই কাজল। সে কথা তুই নিজেই জানিস। পাঁকের মধ্যে পাঁকাল হয়ে বাস করবার সহজাত ক্ষমতা নিয়েই উনি জন্মেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যাকে কুটীচক বলতেন, যাঁকে তীর্থ যেতে হয় না, ঘরে বসেই তীর্থফল লাভ করেন, উনি তো তাই।'

'খুব যে তেল মারছিস!' বলে বটে, কিন্তু কাজলার মুখ জ্বলজ্বল করে।

'সুমিতা, তোর কী হল?'—মালবিকাদি জিজ্ঞেস করে

'কিছুই হল না'—রুমাল দিয়ে মুখ মুছে সুমিতা বলল।

আমি বললুম—'তুই হলুদ টাঙাইল পরে সোনালি পরীটি সেজে যাসনি?'

'গিয়েছিলাম তো! হলুদ কী করে জানলি?'

'আমি যে একটু-আধটু লিখি ভাই। তা প্রজেক্ট ফাইল বার করে কোয়েশ্চনেয়ার দিসনি?'

'তা-ও দিয়েছিলাম। তোকে কে বলল?'

'আমার মন। তারপর পার্কসার্কাস কনেক্টরের কাছে তোদের র‍্যাঁদেভু ঠিক হয়নি।'

'তা-ও হয়েছিল। এটাও কি লিখিস-টিখিস বলেই জানতে পারলি?'

'বলতে পারিস! তো তারপর?'

'তারপর বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কোয়ালিটিতে এক দিন, গ্র্যান্ডে এক দিন।'

'তো সে বিল কোথায়? বললি যে জেরক্স করে দিবি?'

'করা হয়নি, হারিয়ে গেছে, তোদের বিশ্বাস করবার দরকার নেই।'

'সিনেমা, থিয়েটার, রবীন্দ্রসদন, অ্যাকাডেমি, শিশির মঞ্চ, নজরুল মঞ্চ, মধুসূদন...'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। একটা সিটিং শুধু হয় সাইকোঅ্যানালিসিসের। তাতেই বুঝে গেলাম।'

'কী বুঝলি?'

'পার্ফেক্টলি নর্ম্যাল, সেনসিব্‌ল, সেন জেন্টলম্যান। আমি কোনও নতুন মাত্রা আবিষ্কার করতে পারিনি।'

মালবিকাদি নিপুণ কায়দায় ওর মুখে একটা মাংসের চপ ঠুসে দিতে দিতে বলতে থাকল 'বলিনি? বলিনি? কাজপাগল, বেরসিক। জানিস তবুও আমার ভয় ছিল যদি কিছু কেলো করে। ফিফটির পর ছেলেরা একটু ইয়ে হয়ে যায় তসলিমা বলেছে।'

'তা কী বলে খেতে নিয়ে গেলি?'

'আরে তুমি তো জানোই তোমার উনি খাইয়ে বাড়ির ছেলে। আমি যেই সাজেস্ট করেছি কোথাও বসে একটু খেতে খেতে আমি কোয়েশ্চনেয়ারটা পড়ে যাব, আর উনি ইয়েস, নো গুলো বলে যাবেন, অমনি রাজি হয়ে গেলেন। এক দিনই মাত্র চেম্বারে অ্যানালিসিস করাতে নিয়ে যেতে পেরেছি।'

মহা উৎসাহে মাংসের চপ তুলে নিল মালবিকাদি।

কাজলা বলল—'একটু মাস্টার্ড দে না রঞ্জু, শিল্পী মাস্টার্ড নিবি না?' শিল্পী মাথা নাড়ল—'না।'

কাজল বলল—'নে না, মাস্টার্ড ছাড়া কি মাংসের কষা জমে? দ্যাখ শিল্পী, কথাটা বলে তোকে একটু সাবধান করে দিতে চাইলুম, আর কিছু না। তুই যে মনে করিস, খালি হরেক রকম সাজগোজ করলে আর গুচ্ছের রান্না করে খাওয়ালেই সবার মন পাওয়া যায়, এ ধারণাটা তোর ঠিক না। সন্ন্যাস-টন্ন্যাস কিছু না। কিন্তু এর যে আধ্যাত্মিক দিকে প্রবল ঝোঁক, এটা তুই জানতিস? এ সব কথা ও তোকে বলেওনি, কেন না ও তোকে ইমম্যাচিওর মনে করেছে। সেই ইমপ্রেশনই তুই ওকে দশ বছর ঘর করার পর দিয়েছিস। তুই মনে করছিস ওর ডেপ্‌থ্ নেই, ও মনে করছে তোর ডেপ্‌থ্ নেই। এখন তুই জানলি, এই জায়গায় তুই ওকে কম্প্যানি দে, ঠাট্টাতামাশা না করে, তো দেখবি তোর নিমাই ঘরেই আছে।'

শিল্পী বলল—'সত্যি বলছ'—দু হাতে মুখ ঢাকল বেচারি। আঙুলের ফাঁক দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে।

আমরা মহানন্দে মাংসের চপ শেষ করে চা খাই। সুমিতাটার যেমন বাড়াবাড়ি। অত সাজগোজ, ফাইল-টাইল, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, পার্কসার্কাস কনেক্টর, সাইকো-অ্যানালিসিস। বাঃ বাঃ। আমরা কেউই এত সব করিনি। তবে যার যার অ্যাপ্রোচ তার তার। তেমন তেমন অ্যাপ্রোচ হলে রিপ্রোচও হবে।

'তো মিয়ামটা এবার বার করি?'—শিল্পী মৃদু গলায় বলে। শেফালি দরজার কাছ থেকে বাণী দেয়—'মুড়ি খেয়ে মুখ সোঁদা করে নাও সব। দাঁড়াও আমি বরফজল, সরভাজা সব রেডি করি।'

লাল টকটকে ঘন ঝোলের মধ্যে মাছের বলগুলো ভাসছে। ওপরে কিছু বড় বড় তুলসীপাতা ছড়ানো।

মালবিকাদি বললে—'কি রে আমাদের পুজো করবি নাকি? নৈবিদ্যি উচ্ছুগগ্ করেছিস মনে হচ্ছে।'

শিল্পী বলল—'যা দেবী সর্বভূতেষু কাজলদিরূপেণ সংস্থিতা'

সুমিতা বলল—'যা দেবী সর্বভূতেষু মালবিকারূপেণ সংস্থিতা'

কাজল বলল—'যা দেবী সর্বভূতেষু ঢাকাইরূপেণ সংস্থিতা, সী-গ্রিন ঢাকাইটা আমি সুমিতাকে দিচ্ছি, আমাদের মধ্যে দিয়েই ও বাজি জিতেছে বলে, আর আমার একটা ফোকটিয়া বালুচরি লাভ হয়েছে বলে...।

শেফালি কখন এক শাঁখ নিয়ে এসেছে ভগবান জানেন। হাততালি দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠে 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমো।' তারপরে শাঁখ বাজিয়ে দেয়।

তো মিয়ামের তাই-বাটিতে তাই-চামচ ডোবাই আমরা কোশার গঙ্গাজলে যেন কুশি ডোবাচ্ছি। তারপরেই ওরেব্বাপ্ চাঁদি পর্যন্ত জ্বলে যায়।

এইভাবেই হেসে, কেঁদে, কেশে, জ্বলে আমাদের আড্ডার দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয়।

পরিশেষ

শিল্পী আর মালবিকাদি চলে গেল সবচেয়ে আগে। তারপর কাজলকে নিতাইয়ের রিকশায় তুলে দিই। সুমিতা টয়লেটে গেছে। একটু পরে লিপস্টিক, ব্লাশার সব মুছে, মুখচোখ থেকে জল ঝরাতে ঝরাতে এল। ব্যাগ থেকে ভেসলিন বার করে ঠোঁটে লাগাল। বলল, 'ওরা সব চলে গেছে? কাজলদিটা শিল্পীকেও খুব একহাত নিল, না?'

'তুইও নিলি কম নয়, আমাদের সবাইকে।'

'আমি আবার কী নিলাম?'

'সত্যি কথা তো বলিসনি।'

'বুঝতে পেরেছিলি? কী করে?'

'বা রে আমার কল্পনার হলুদ শাড়ি, ফাইল, প্রজেক্ট, কোয়েশ্চনেয়ার সবই মিলে গেলেও বুঝব না? তা ছাড়া তুই তো আমায় সব বলবার জন্যেই সময় নিচ্ছিস।'

'বলব আর কী! মুখটা আমার বীভৎস লাগছে না? ঠোঁটটা ঝুলে যায়নি?'

'কোন বীভৎস? আগেকার মানে না এখনকার?'

'আগেকার, আগেকার।'

'মুখটা একটু ফোলা ফোলা লাগছে বটে, ঠোঁটটাও তাই, কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার আর কী? বিকাশকান্তি স্যান্যাল।'

'সত্যি? সুমিতা!'

'কালীপদর মা ছিল বলে কোনওমতে বেঁচেছি। চেম্বারে ঘটে। এক সপ্তাহেও দ্যাখ দাগগুলো যায়নি।'

'বলিস কী? এ যে বীভৎস ডাইমেনশন? দাঁড়িয়ে আছিস কী করে?'

'সাইকলজির লোক' মনে রাখিস কিন্তু মুশকিল হল এ কথা কি মালবিকাদিকে বলা যায়?'

'শুভমকেই বা কী বললি?'

'সে তো একটা গাধা। পুরনো পেয়ারের কথা দিদিভাইটিকে বলতে পেরে তার এখন এমন কাথারসিস হয়ে গেছে যে সে আর কিছুই লক্ষ করছে না। সে ভেবেছে সে-ই এমনটা করেছে।'

হাসব না কাদব ভেবে পাই না। বলি—'তা তুই জানতিস ওর ওই বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের কথা?'

'জানব না? খ্যাপার মতো হয়ে গিয়েছিল তো। তাইতেই তো নিলয়দা আমায় বলল, 'সুমিতা, তুমি তো সাইকলজির লোক, দেখো তো কিছু করতে

পারো কি না? তোমাকে অনেকটা ওই মেয়েটির মতো দেখতে!'

'তুই এত বড় রিস্ক নিলি?'

'দ্যাখ রঞ্জুদি, আমি সাইকলজির ছাত্রী। মানুষের মন জানা আর তার ওপরে কন্ট্রোল এনে তাকে সারিয়ে তোলা এর চেয়ে বেশি ইনটারেস্ট আমার কিছুতেই নেই। বিকাশকান্তিরটাতে ভয় খেয়ে গেলাম। তবে সত্যি কথা বলতে কি মালবিকাদি যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের তত্ত্ব বলে গেল, সেটা আমার একেবারেই মাথায় আসেনি ভাই।'

'মালবিকাদির তা হলে গুরুমারা বিদ্যে বল।'

'তাই তো দেখছি। খালি নিজের কেসে বেচারি সুবিধে করতে পারল না।'

'চলি রে রঞ্জুদি'—চটিতে পা গলিয়ে সুমিতা 'সাইকলজির লোক' চলে গেল তখন আটটা বাজে বাজে।

ঘরটা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছে শেফালি। এখন ঢুকলে আর মাছ-মাংস বিভিন্ন রকম পারফ্যুমের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। একতলার ঘর হলেও কর্নার প্লট বলে খুব হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। আর সেই সঙ্গে ঘরময় ছড়িয়ে যাচ্ছে যূথীর গন্ধ। কেয়ার বন্যতাও কি একটু মিশছে তাতে? মালবিকা সান্যালের মুখ উড়ছে যূথীর গন্ধে, কেয়ার সাদায় মুখের রেখাগুলো সাদা হয়ে যাচ্ছে।

দরজার বেলটা বাজল। শেফালিকে বললুম—'দ্যাখ তো, বোধ হয় দাদা এল।'

'দাদা তো কতক্ষণ আগেই এসে গেছে। তোমরা হাল্লা করছিলে বলে বুঝতে পারোনি। সে এখন চান-টান করে পাজামা পাঞ্জাবি পরে তোমার গোলাপ ফুলের সুবাস নিচ্ছে গো!'

'আচ্ছা যা যা, এখন দেখ তো কে এলো।'

একটু পরে যিনি এসে দাঁড়ালেন তিনি অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ মিত্র। গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁচি ধুতি, কাঁধে শান্তিনিকেতনি ঝোলা।

'আপনি?'

'কাজল, মানে কাজল এখনও...এখানে আছে...নিতে'

'সে কী? কাজল এখনও পৌঁছয়নি? এই তো আধঘণ্টা আগে রিকশা করে চলে গেল।'

'না...মানে আমি...কলেজস্ট্রিট...মীটিং...স্ট্রেইট...তাই...'

'আপনি বসুন। চা খাবেন তো?'

'হ্যাঁ...তা...না...যদি...'

গঙ্গাপ্রসাদ একটা সোফায় বসে মুখ নিচু করে অন্যমনস্কভাবে নিজের পাঞ্জাবির কোল দেখতে লাগলেন।

আমি শেফালিকে বললুম—তার দাদাকে ডেকে আনতে।

'ইনি অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ মিত্র, কাজলের স্বামী', আমি পরিচয় করিয়ে দিই,

'আর ইনি আমার স্বামী নিরুপম...'

'ও, আচ্ছা' হাত তুলে নমস্কার করল নিরুপম। কাউন্সিলরের কাছে মানুষ নানা প্রয়োজনে আসে।

গঙ্গাপ্রসাদ ফিকে একটু হাসলেন। প্রতি-নমস্কার করলেন না। ভুলে গেছেন।

আমি দুজনকে বসিয়ে চা আনতে যাই। শেফালিগিন্নি বললেন 'এই গরমে অসময়ে চা দেবে কেন বউদি, বরং তোমার সেই জিরের শরবত করে দাও।'

সেটাই তৈরি করছি, সারাদিনের আড্ডার ক্লান্তিতে হাত চলছে না, নিরুপম রান্নাঘরে এসে ঢুকল, বলল—'উনি কোনও কথাই বলছেন না আমার সঙ্গে, বোধ হয় তোমায় কিছু বলতে চান।' 'তোমায়' কথাটার ওপর অস্বাভাবিক জোর দিয়ে নিরুপম সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে গেল। হাওয়াই চপ্পলের আওয়াজটা থ্যাপ্ থ্যাপ্ করে কানে বাজতে লাগল।

আমি শরবত নিয়ে বসার ঘরে ঢুকতেই গঙ্গাপ্রসাদ শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। কাঁধের ঝোলা পড়ে গেল। চশমা খুলে এল, উনি চশমা পরে নিলেন, ঝোলা তুলে নিলেন।

এ কী ? উনি কি আমার হাতের শরবতের গ্লাসটা দেখতে পাচ্ছেন না ? অদ্ভুত তো ! ঝোলা থেকে একটা বই বার করে শরবত-এর ওপর রাখছেন, চোখ কোথায় ওঁর ?

'"বাসমতীর উপাখ্যান"...জীবনানন্দ...মানুষ নয়...দেশ ভাগ...একটা জায়গা... সম্পাদনা দেবেশ রায়... প্রতিক্ষণ... পড়েননি... বার করেছে... পঞ্চম খণ্ড... অনেক পরে...' কাঁপা কাঁপা ব্যারিটোনে থেমে থেমে এই কথাগুলো উনি বলে যেতে থাকলেন যেন ওঁর বক্তব্য কখনও শেষও হবে না, সংলগ্নও হবে না।